ডিসেম্বর, ২০১৪

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **রাজেশ কুমার ঝা**

সম্পাদনায় : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতীয় সংস্থাগুলি বিদেশে পাড়ি দেয় কেন? — ভি. এন. বালাসুব্রমনিয়াম ও নিকোলাস ফরসাঁস ৫
- ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ : নীতি পরিবর্তন এবং রাজ্যভিত্তিক বৈচিত্র — সজিন শিন ১০
- ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আঞ্চলিক বৈষম্য : একটি সমীক্ষা — ড. এস আর কেশব ১৩
- ভারতের বহির্বাণিজ্য — অনিন্দ্য ভুক্ত ২০
- ভারতে খুচরো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বিপদ নাকি বিকাশের সম্ভাব্য উৎস — ড. লীনা অজিত কৌশল ২৬
- বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সংযোগ রাজ্যের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত — ত্রিদিবেশ সিং মাইনি ২৯
- বিকেন্দ্রীভূত কৃষি গবেষণায় আরও ফান্ড — রাজেশ্বরী এস. রায়না, বিশ্বনাথ রেড্ডি, কে. কিংস্‌লী ইম্যানুয়েল রাজ এবং রমেশ কুমার ৩২

বিশেষ নিবন্ধ

- সেকেলে আইনের উভয় সংকটে অনাবাসী ভারতীয় সমাজ — অনিল মালহোত্রা ৩৭
- পাট ছাড়া গতি নেই পাটের ব্যাগ পলিথিনের অন্যতম বিকল্প — ড. সিতাংশু সরকার ৪১

নব পরিকল্পনা

- উন্নয়নের রূপরেখা ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত ৪৭
- জানেন কি? আর্থিক বিশ্বায়ন (ফিনানশিয়াল গ্লোবালাইজেশন) — আনন্দ গুপ্ত ৫৭
- প্রতিযোগিতা প্রস্তুতি (ফ্যাশন দুনিয়ার পেশাদাররা) — মহুয়া গিরি ৫৮
- যোজনা ক্যুইজ — জয়ন্ত সাহা ৬২

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

এফডিআই এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি

স্বাধীনতার পর প্রায় সাত-সাতটি দশক কেটে যেতে চলল। এই ক'বছরে শুধু গঙ্গা বা ভল্গা কেন, দানিউব, মিসিসিপি, ইয়াংসে, নীল ও আমাজন দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বিশ্বের অর্থনৈতিক চালচিত্রে ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল তা আজ তার ঔজ্জ্বল্য ও গুরুত্ব হারিয়েছে অনেকটাই। একে অপরের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র আজ অনেকটাই সংযুক্ত ; অর্ধ-শতক আগেও তাদের ভবিষ্যৎ পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের ভবিষ্যৎ একে অপরের সঙ্গে যত গভীরভাবে যুক্ত ছিল, আজ তার তুলনায় তা অনেক বেশি সম্পৃক্ত। এরিক হব্‌সবম-এর বিখ্যাত বইগুলি 'এজ অব এম্পায়ার' (সাম্রাজ্যের যুগ), 'এজ অব রেভলিউশান' (বিপ্লবের যুগ) এবং 'এজ অব ক্যাপিটাল' (মূলধন বিনিয়োগ-এর যুগ) যেন আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ বাস্তবে পরিণত হতে দেখলাম আমরা। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত এখন এক দেশ থেকে অন্য দেশের বহমানতার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। পরস্পর সম্পৃক্ত এই বিশ্বের ক্ষমতাকে জানতে এবং বুঝতে হলে এর নিরপেক্ষ অর্থব্যবস্থাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের রপ্তানি বিকল্পীকরণ শিল্পব্যবস্থা (Import Substitution Industrialisation, ISI) মডেলগুলি থেকে শুরু করে ভারতীয় বৈদেশিক বিকাশের প্রবাহের মতো বেশ কিছু নির্দিষ্ট পর্যায়কে ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে একত্র করে দেখা যায়। দেখা গেছে যে ১৯৬৯-৭৫ সালের এফডিআই প্রবাহের ধারা প্রথমে ছিল এফডিআই বিরোধী। তার পর ১৯৭৫-৯১ সাল পর্যন্ত হল এফডিআই-এর প্রতি বিশেষভাবে (selective) পক্ষপাতশীল এবং তার পর, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংস্থানের পরবর্তী পর্যায়ে হয়ে উঠল এফডিআই-এর প্রতি পক্ষপাতশীল—এটা সংস্কারের পরের ঘটনা। ভারতীয় অর্থনীতির ধারার সঙ্গে অর্থনৈতিক নীতির এই পর্যায়গুলি স্পষ্টভাবে ওঠানামা করেছে এবং অর্থনৈতিক নীতির এই পর্যায়গুলি ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রত্যেকটি পর্যায়ের সঙ্গে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, দেশের সার্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অর্থনৈতিক বিকাশের এই পরিবর্তনকে বিচার করার মধ্যে একটা যুক্তি আছে যা যথেষ্ট যুক্তিসংগত। স্বাধীনতার পরের দশকগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নতির বিকাশ ও তার মডেল সম্পর্কে যথেষ্ট বিরোধ থাকলেও একটা বিষয়ে সবাই মোটামুটি এক মত—ভারত একটি শক্তিশালী এবং টেঁকসই অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয় যা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতেও সক্ষম।

যোজনা

সাংগঠনিক সংস্কার দেশের প্রতি এফডিআই-কে আকর্ষিত করবার পক্ষে অত্যন্ত সফল এক চাবিকাঠি। ভারতে এফডিআই-কে সফল করে তোলার জন্য ভারত বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিরক্ষা উৎপাদন, গঠন, পাইকারি মূল্য ব্যবস্থা ইত্যাদি এফডিআই-এর পথ প্রশস্ত করতে সাহায্য করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' পদক্ষেপ ও আমন্ত্রণের মাধ্যমে সরকার দেশকে একটি সফল 'উৎপাদন কেন্দ্র' ('Make in India Hub') হিসাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলে বিদেশি কোম্পানিগুলি বহুলাংশে ভারতে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে। ফলে ভারতে ১৯৯২ সালে বিনিয়োগের অংশভাগ ছিল জিডিপি-০.১ শতাংশ যা ২০১১ সালে বেড়ে হয় ১.৭ শতাংশ। ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বার সম্ভাবনা আছে।

যা হোক, বর্তমানে ভারতের কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিশ্বায়নের দ্বারা যে সমস্ত সুযোগ আমাদের দিকে উৎক্ষেপিত হয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ ও সদ্ব্যবহার যাতে আমরা গ্রহণ করতে পারি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত কারণে এই সুযোগ যেন কোনওমতেই ব্যাহত ও বিনষ্ট না হয়—এটাই দেখার। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াবার উদ্দেশ্যে গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলির সাফল্য নির্ভর করে সমাজে মতৈক্য গড়ে তোলার ওপর—বিশেষ করে তাদের মধ্যে, যাঁরা প্রান্তিক এবং যাঁরা শৈশবে এবং পরিবেশগত কারণে স্থানান্তরিত হওয়ার ভয়ে দিন কাটান। এই বিশেষ সত্যটিকে যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যে অন্ধকার ছায়া আমাদের জীবন ও জীবিকাকে আঁধারে ঢেকে দিয়েছিল তাকে আমরা ভুলতে বসব, ভুলতে বসব বর্তমান যুগের এফডিআই নামক কল্যাণকারী কামধেনুটির কথা—তাও কি কখনও সম্ভব?❑

ভারতীয় সংস্থাগুলি বিদেশে পাড়ি দেয় কেন?

"দিবে আর নিবে।" নিছক কথার কথা নয়। লগ্নি প্রসঙ্গে ভারতকে নিয়ে হলফ করে একথা বলার দিন এসেছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানার পাশাপাশি ইদানীং বিদেশে লগ্নিতেও ভারতের ভূমিকা হেলাফেলার নয়। কী করে সম্ভব হল এ উলটপুরাণ। কারা এর হোতা। তার হদিশ মিলবে **ভি. এন. বালাসুব্রমনিয়াম** ও **নিকোলাস ফরসাঁস**-*এর এই লেখায়।*

অধুনা শুধু প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ব্যবস্থা দরাজ করা নয়, বিদেশে লগ্নিতেও উঠে এসেছে ভারত এবং চীন। তবে কিনা চীনের তুলনায় ভারতের বিনিয়োগ ঢের কম। ভারত বিদেশে লগ্নি করে মূলত উৎপাদন ও পরিষেবায়। আর তার অধিকাংশটা উন্নত দেশে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমেরিকা ও ব্রিটেনে বিদেশি সংস্থা অধিগ্রহণের (অ্যাকুইজিশান) মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বিদেশে লগ্নিতে অগ্রণী অন্য বিকাশশীল দেশগুলির সঙ্গে ভারত খাপছাড়া বইকি। এই রকমফের খতিয়ে দেখা দরকার। এ নিবন্ধের বক্তব্য এজন্য বাহাদুরি দিতে হবে ভারতীয় সংস্থাগুলির ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজারি সংক্রান্ত বিশেষ দক্ষতাকে।

বিদেশে ভারতের লগ্নির আকারপ্রকার

১৯৯০ সালে বিদেশে ভারতের বিনিয়োগ ছিল সাকুল্যে ১২.৪ কোটি মার্কিন ডলার। আর ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১,১২৫.৭ কোটি। এটা বিকাশশীল দেশগুলির বিদেশে মোট প্রত্যক্ষ লগ্নির ৩ শতাংশ।

বিদেশে লগ্নির ধাঁচে ভারত ও চীনের মধ্যে অমিল যথেষ্ট। চীন বেশিরভাগ লগ্নি করে তেল ও কাঁচামালে। ভারতের বিনিয়োগ মূলত উৎপাদন শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রে (সারণি-২)।

বিদেশে ভারতের প্রত্যক্ষ লগ্নির ৫০ শতাংশের বেশি উন্নত দেশগুলিতে। সে জায়গায় চীন ৭৫ শতাংশের বেশি বিনিয়োগ করেছে বিকাশশীল বিশ্বে (রেখাচিত্র-১)।

ব্রিটেনে ২০০৮ সালে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগে ভারত দ্বিতীয় স্থানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম (রেখাচিত্র-২)।

বিদেশে ভারতের লগ্নির অধিকাংশটা অধিগ্রহণের মাধ্যমে (রেখাচিত্র-৩)। ২০১০ সালের আগস্টে শেষ হওয়া বছরে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত দ্বিতীয় স্থানে। বিদেশে অধিগ্রহণ ও সংযুক্তিকরণ (মার্জার) খাতে বিকাশশীল দেশগুলির মোট লগ্নিতে ভারতের অংশ ২৪ ভাগ। ২০০০-০৯ সালে ১৩৪৭টি অধিগ্রহণ ও সংযুক্তিকরণ বাবদ ভারতীয় সংস্থাগুলি বিনিয়োগ করেছে ৭২০ কোটি মার্কিন ডলার (সারণি-৩)।

টাটাগোষ্ঠী অধিগ্রহণ করেছে টেটলি টি, জাগুয়ার ও ল্যান্ডরোভার, কোরাস স্টিল। মাল্যর সংস্থা হাতে নিয়েছে স্কটল্যান্ডের মদ কারখানা হোয়াইট অ্যান্ড ম্যাকাই। এছাড়া সফটওয়্যার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিনিয়োগের খবরও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে সংবাদ মাধ্যমে।

বাঁধা গত-এর বিশ্লেষণ

কোনও সংস্থা বিদেশে কেন লগ্নি করে। আপেক্ষিক সুবিধায় তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব (O) কাজে লাগিয়ে মুনাফা হাসিল করাই এর লক্ষ্য। অপূর্ণাঙ্গ বাজার ও পণ্য রপ্তানি বা বিদেশি সংস্থাকে লাইসেন্স দেবার ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের বাধাবিপত্তি থাকলে বিদেশে লগ্নির কথাটা বেশি করে খাটে। স্টিফেন হাইমার (১৯৭৬)-এর এই বিশ্লেষণের সঙ্গে জোড়া হয়েছে বিদেশে লগ্নির জন্য স্থান বাছাই (L) ও আগ্রাসনের থাবা থেকে একচেটিয়া সুবিধাকে আড়াল করার তাগবাগ (I)। একে বলা হয় বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নির OLI বা eclectic (সমন্বয়) তত্ত্ব (ডানিং ১৯৯৩)।

ভারত ও চীন থেকে বিদেশে লগ্নির ব্যাপারে ইদানীং এই তত্ত্ব যাচাই করা হয়েছে (প্রধান ২০১১, বাকলে ও অন্যান্য ২০০৭, কুমার ২০০৭ এবং নানেন কাম্প ও অন্যান্য ২০১০)। ভারত নিয়ে কাজে অগ্রণী জয়প্রকাশ প্রধান। তিনি (২০০৮, ২০১১, ২০০৪) সংবাদ মাধ্যমসহ বিভিন্ন সূত্র ও সরকারের অপ্রকাশিত তথ্য সংকলনের দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন।

প্রধান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শ্রমের উচ্চ উৎপাদনশীলতা, গবেষণা-বিকাশ ব্যয়, ম্যানেজারি দক্ষতা, রপ্তানি ও ১৯৯১ সালের পর উদারীকরণ—সবই ভারতীয় উৎপাদন সংস্থাগুলিকে বিদেশে লগ্নির জন্য হাতছানি দিয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি মূলধন-নির্ভর হওয়ায় ভারতীয় সংস্থায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা উঁচুতে। এছাড়া, সংস্থাগুলির উপস্থিতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মূলধন-নির্ভর শিল্পে। উদারীকরণের আগে দেশে চলছিল আমদানির বিকল্প শিল্পায়নের নীতি। এই নীতির ফলশ্রুতি ভারতীয় উৎপাদন সংস্থাগুলিতে মূলধন-নির্ভরতার উপরোক্ত দুই বৈশিষ্ট্য (ভগবতী ও দেশাই ১৯৭০, পানগড়িয়া ২০০৮)। বস্তুত উৎপাদন ক্ষেত্রের অধিকাংশ সাব গ্রুপে চীনের তুলনায় ভারতীয় সংস্থাগুলি ঢের বেশি মূলধন-নির্ভর (বালাসুব্রমনিয়াম ও স্যান্স ফোর্ড ২০০৭)।

সারণি-১
চীন ও ভারতের বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নি

(কোটি মার্কিন ডলারে)

	১৯৮১	১৯৮৫	১৯৯০	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
চীন	৩.৯	৯০	৪৪৫.৫	১৭৭৬.৮	২৭৭৬.৮	৫৭২০.৬	৭৩৩৩	৯৫৭৯.৯	১৪৭৯৪.৯	২২৯৬০	২৯৭৬০	৩৬৫৯৮.১
ভারত	৮	৯.৩	১২.৪	৪৯.৫	১৭৩.৩	৯৭৪.১	২৭০৩.৬	৪৪০৮	৬২৪৫.১	৭৭২০.৭	৯২৪০.৭	১১১২৫.৭

উৎস : আঙ্কটাড (ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)।

সারণি-২
চীন ও ভারতের বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নি

	ভারত				চীন			
	২০০০-০১ থেকে ২০০৬-০৭ (১০০ কোটি ডলারের অঙ্কে)	অংশভাগ	২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২ (১০০ কোটি ডলারের অঙ্কে)	অংশভাগ	২০০৪ থেকে ২০০৭ (১০০ কোটি ডলারের অঙ্কে)	অংশভাগ	২০০৮ থেকে ২০১০ (১০০ কোটি ডলারের অঙ্কে)	অংশভাগ
প্রাথমিক ক্ষেত্র (প্রাইমারি সেক্টর)	১.০৬	০.৬৪	৪.৯৪	৮.৫৩	১৬.৯৩	২৬	২৫.৯৩	১৪.৩
দ্বিতীয় বর্গের ক্ষেত্র (সেকেনডারি সেক্টর)	১০.৯৮	৪৩.৪৬	২৫.৯৬	৪৫	৬.০৬	৯	১৪.১৮	৭.৮৩
তৃতীয় বর্গের ক্ষেত্র (টারশিয়ারি সেক্টর)	১৩.২২	৫২	২৬.৯৩	৪৫.৬৪	৪২.৩৪	৬৫	১৪১.১৪	৭৭.৮৭
মোট	**২৫.২৬**		**৫৭.৮৬**		**৬৫.৪৩**		**১৮১.২৪**	

উৎস : আঙ্কটাড (ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)।

সারণি-৩
ভারতীয় সংস্থার দেশভিত্তিক সংযুক্তিকরণ ও অধিগ্রহণ

(২০০০-২০০৯)

দেশ	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	**মোট**
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২	১২	৯	১৭	২০	৩৫	৪৩	৬২	৭৬	২৭	৩২৩
গ্রেট ব্রিটেন	৫	২	৮	১১	৭	১৬	২৬	২০	৩৬	১২	১৪৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র + গ্রেট ব্রিটেন	২৭	১৪	১৭	২৮	২৭	৫১	৬৯	৮২	১১২	৩৯	৪৬৬
কানাডা	০	০	০	০	০	২	৫	৯	৭	৯	৩২
অন্যান্য	৩৪	২৯	৩৪	৫২	৪৭	৯১	১১১	১১২	১৯৮	১৪১	৮৪৯
মোট	**৬১**	**৪৩**	**৫১**	**৮০**	**৭৪**	**১৪৪**	**১৮৫**	**২০৩**	**৩১৭**	**১৮৯**	**১৩৪৭**

উৎস : টমসন ওয়ান ব্যাঙ্কার (২০১০)।

ভারতীয় সংস্থাগুলির বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নির বিশ্লেষণে প্রধানের ব্যবহৃত চলক (ভ্যারিয়েবলস) তালিকায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যানেজারি দক্ষতা। সত্যি তো, ব্যবস্থাপনায় দড় হওয়াটা সংস্থাগুলিকে বিদেশে কাজকর্ম সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্তের পিছনে একটা বড় প্রভাব ফেলে। অবশ্য ব্যবস্থাপনার এই কুশলতা পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়। প্রধান ব্যবস্থাপকদের সহজাত এই দক্ষতা মাপার এক কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। তবে এই পরিমাপ নিয়ে একটা ফ্যাকড়া থাকতে পারে। এটা নিছক মূলধন বাবদ মোট লাভ বা রিটার্ন দেখাতে পারে, ধরা যাক, মজুরি বাদ দিয়ে যে দাম সংযোজিত বা যুক্ত হল। মজুরি হার কম হলে সংযোজিত দাম হবে বেশি। অন্যভাবে দেখলে, বেশি মুনাফা হয়তো ব্যবস্থাপনার কুশলতার জন্য নয়। এটা স্রেফ মূলধন বাবদ মোট লাভ, যা কি না মার্কসীয় পরিভাষায় অনুপার্জিত আয়।

উদারীকরণের পর ভারতের অর্থনীতিতে সার্বিক উপাদানের উৎপাদনশীলতার হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে তা আহামরি কিছু বাড়েনি (দেব কুসুম ও অন্যান্য ২০১০; গোলদার ও কুমার ২০০২; সেন ২০০৭)। গোলদার ও কুমারের হিসেবনিকেশ অনুসারে প্রাক্-উদারীকরণে যুগের তুলনায় উদারীকরণের পর ভারতীয় উৎপাদন শিল্পে সার্বিক উপাদানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার বরং পড়তির দিকে। তাদের মতে উৎপাদন শিল্পের

ক্ষমতা কম কাজে লাগানোই এজন্য দায়ী। আরও এক সমীক্ষা (মুখার্জি ও মজুমদার ২০০৭) একই কথা জানিয়েছে। এরা ১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশের সংগঠিত উৎপাদন শিল্পে কারিগরি পরিবর্তনের বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন।

অধিকাংশ উৎপাদন সংস্থায় কারিগরি দক্ষতার অভাব। কিন্তু এজন্য ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষের খামতি আছে ভাবাটা ভুল। শ্রম আইনের কড়াকড়ি ও নতুন নতুন উদ্যোগে আমলাতান্ত্রিক বাগড়া দেবার মানসিকতার দরুন হয়তো ব্যবস্থাপক মুনাফার জন্য মূলধন-নির্ভর প্রযুক্তি বেছে নিয়েছেন।

এই নিবন্ধে আগে বলা হয়েছে যে দেদার মুনাফাকারী সংস্থাগুলি বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণের দিকে ঝোঁকে। তবে এ ধরনের সব সংস্থা তা করতে সক্ষম হবে এমন নয়। বিদেশে বিনিয়োগকারী অনেক সংস্থা লগ্নির টাকা তোলে আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে। বিদেশে লগ্নিকারী ভারতীয় সংস্থা উদ্যোগ সংক্রান্ত এক বিলক্ষণ সুবিধে ভোগ করে। এই সুযোগসুবিধের মধ্যে অন্যতম ব্যবস্থাপনা কুশলতা, ঝুঁকি গ্রহণ, নতুন নতুন বাজারের সম্ভাবনা নিয়ে আগাম অনুমান। এসব ব্যাপারস্যাপারে উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে ভারত কয়েক যোজন এগিয়ে। কীভাবে ও কোথা থেকে আসে ভারতীয় ম্যানেজারদের এসব গুণ।

বিদেশে কারবার ফাঁদা ভারতীয় সংস্থার অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

কোন কোন কারণে সংস্থা বিদেশে পাড়ি জমায় তা সাধারণভাবে বলা অসম্ভব (রামমূর্তি ২০০৮; আত্রেয়ী ও সঈদ ২০১৩; অতুকোরালা ২০০৯)। উদীয়মান অর্থনীতির বেশিরভাগ সংস্থার কাছে একটা হেতু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কারিগরি উৎকর্ষ হাতে পাবার প্রলোভন। এটাই হচ্ছে বিদেশে সরাসরি লগ্নি মারফত তথাকথিত সম্পদ লাভের অভিপ্রায়। বিদেশে অধিগ্রহণের জন্য ম্যানেজারি দক্ষতা থাকা দরকার। যে সংস্থা অধিগ্রহণের লক্ষ নেওয়া হয়েছে তার সম্পদের প্রকৃতি ও উৎপাদনশীলতা, বাজারের সম্ভাব্যতা, বিদেশ বিভুঁইয়ে কারবার চালানোর ঝুঁকি, সর্বোপরি

চিত্র-১
২০০৯ সালে বিদেশে চীনা লগ্নি
(অঞ্চলভিত্তিক, মার্কিন ডলারের হিসাবে শতকরা ভাগ)

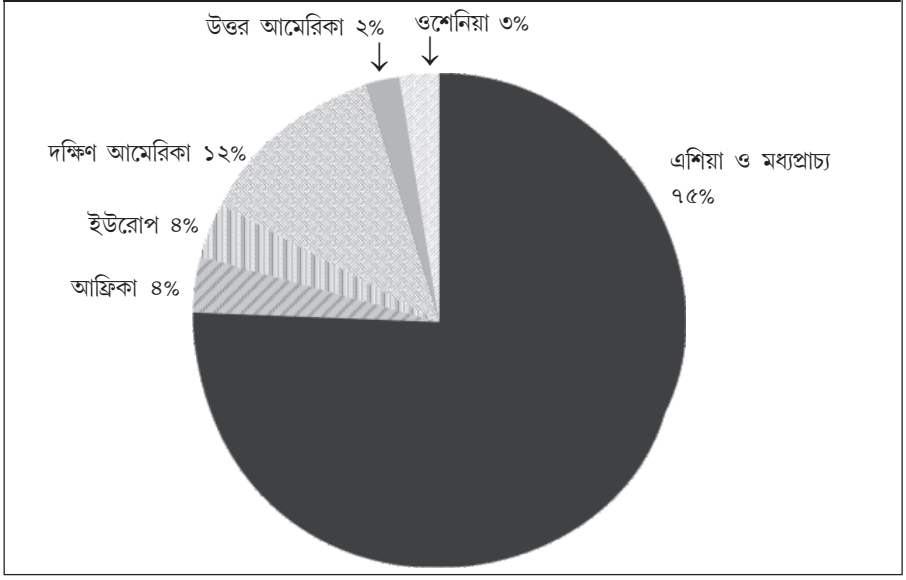

চিত্র-২
ব্রিটেনে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি
(শতাংশে)

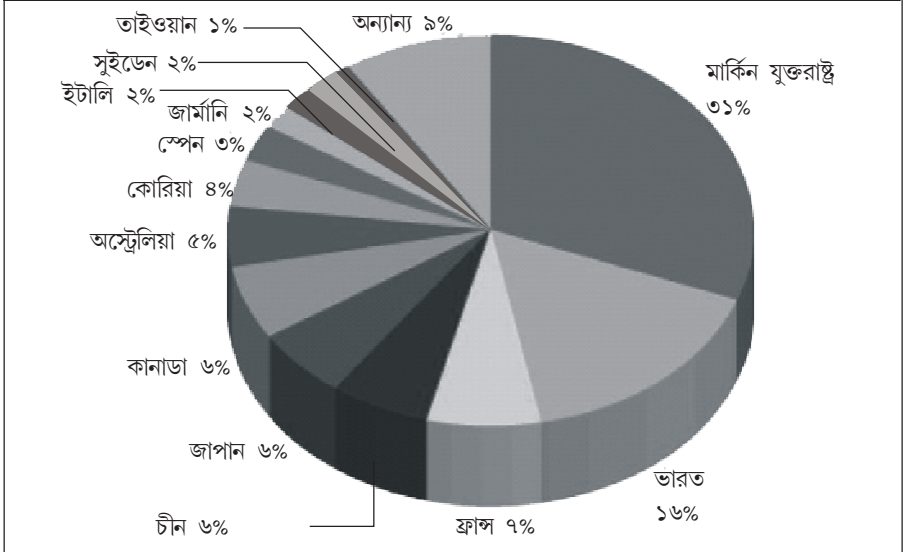

সূত্র : দ্য ইকনমিস্ট, ২০০৯।

বাইরের মুলুকে কাজকর্ম সামলানোর ক্ষমতা খতিয়ে দেখা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব।

এছাড়া, অধিগৃহীত সংস্থাকে চাঙ্গা করার ব্যাপারস্যাপারও অনেক সময় থাকে বইকি। উৎপাদন সংক্রান্তে সুবিধে থাকা সত্ত্বেও সঠিক বিপণন কৌশলের অভাবে সংস্থাটি হয়তো ধুঁকছে। বিদেশে লগ্নিকারী ভারতীয় সংস্থার ব্যবস্থাপকদের এসব সামলানোর এলেম আছে বলে ধরা হয়। যা কিনা কেইনসের ভাষায় উদ্যোক্তার 'অ্যানিমাল স্পিরিটস'—সহজাত প্রকৃতি। এহেন উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রতিভার দরুন বেশ কিছু ভারতীয় সংস্থা, বিশেষত টাটা গোষ্ঠী বিদেশে লগ্নির জন্য আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে টাকাকড়ি তুলেছে। ন্যাথানিয়েল লেফ (১৯৭৯)-এর কথায় "কুশলী উদ্যোক্তা

বলতে চোখে ভেসে ওঠে একেবারে হালের তথ্যাদি তার হাতের মুঠোয় আর তার অসামান্য সৃজনীকল্পনা। নয়া উদ্যোগের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ছেঁটে ফেলতে এসব গুণই ভরসা। অন্য লগ্নিকারী যা উপেক্ষা বা বাতিল করে দিয়েছে।"

উদ্যোগকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ঠেকায় পড়ে উদ্যোগ। আর মশুকা কাজে লাগানোর উদ্যোগ (কোস্টার ও রাজ ২০০৮)। শ্রমের বাজার সঙ্গিন হয়ে পড়লে কর্মপ্রার্থীরা দায়ে পড়ে নিজেই উৎপাদনে নেমে পড়ে। অন্যদিকে নতুন নতুন বাজার দখলের জন্য সংস্থা ঝাঁপিয়ে পড়লে তাকে মশুকা কাজে লাগানোর উদ্যোগ আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, উদারীকরণের পর ভারতীয় সংস্থার বিদেশে পাড়ি জমানো। এর আর এক নাম শ্যুম্পেটীয় উদ্যোগ।

ভারতীয় সংস্থার উদ্যোগ সংক্রান্ত সহজাত প্রবৃত্তি ও মুনশিয়ানা* আদতে ভারতীয় অর্থনীতির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের ফলশ্রুতি। বহু জাতপাত ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গড়া ভারতীয় সমাজে ব্যবসায়িক উদ্যোগের ইতিহাস বহুকালের। ব্যবসায়ী জাতের মধ্যে কেষ্টবিষ্টু হচ্ছে মাড়োয়ারি ও বেনিয়া। এরা মূলত পাইকারি সদাগর ও মহাজন। ইংরেজের ঔপনিবেশিক জমানায় বিদেশ বাণিজ্যে টাকা খাটানোয় এরা ছিল সবার চেয়ে দড়। পার্সিরা স্বতন্ত্র ধাঁচের। ইংরেজ ও ভারতীয় ব্যবসা সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগের কাজ করত এরা।

হরিশ দামোদরন (২০০৮) ইংরেজের সঙ্গে পার্সিদের বিশেষ সম্পর্ক চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন "হিন্দু বা মুসলিম এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত না হওয়ায়, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ না করায়, ভারুচ, সুরাত ও দমন বন্দরের কাছাকাছি বসবাসের দরুন বাণিজ্যিক সংস্পর্শে আসার সুযোগের ফলে নেটিব ব্রোকার, এজেন্ট ও জাহাজ বা অন্য পরিবহণে মাল লেনদেনকারী হিসেবে পার্সিদের জুড়ি মেলা ভার বলে মনে করা হত।" ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল ব্যাপক।

চিত্র-৩
ভারতীয় ও চীনা অধিগ্রহণ

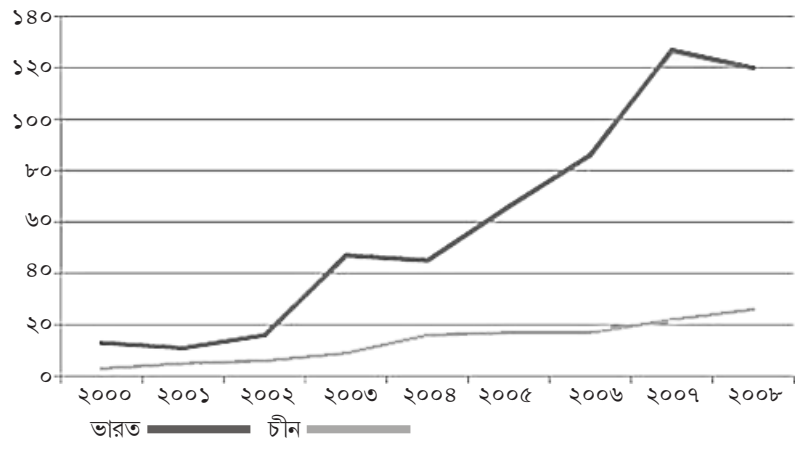

সূত্র : ডে'ব্লু ও দুয়ানমু (২০১২)।

উনিশ শতকে চীনে কোম্পানির মোটা মুনাফায় আফিম চালানের ব্যবসায় হিস্যে ছিল পার্সিদের।

পার্সি ও বেনিয়া উভয়ে উৎসাহী ছিল তুলো, চা, রেশম ও অন্যান্য কাঁচামালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে। ঔপনিবেশিক রাজত্বে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইউরোপ ও ভারত এই দুই ভিন কৃষ্টির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিতে পারত। এ ব্যাপারে তীর্থঙ্কর রায় (২০১১) লিখেছেন "সামাজিক রীতিনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্র ও কর্পোরেট আইনের সংগঠিত জগৎ এর মধ্যে আনাগোনায় ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়রা ছিল পটু। ইউরোপীয় সংস্থাগুলির জোট (কার্টেল)-এর অসাধু উপায় ভেস্তে দিতে এই কুশলতা তারা কাজে লাগায়।

ভারতে ব্যবসায় গোষ্ঠীর বেশ রমরমা। আবার এসব গোষ্ঠীর অধিকাংশ পরিবারকেন্দ্রিক। এটাও ভারতীয় সংস্থায় উদ্যোগ-প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করেছে। ২০০০ থেকে ২০০৮ সময়কালে ভারতের সংস্থাগুলি বিদেশে ১৩৪৭টি সংস্থা কবজা করেছে। এর তিন-চতুর্থাংশ অধিগ্রহণ করেছে গোষ্ঠীগুলি (প্রধান ২০১০, খন্না ও পালেপু ১৯৯৭, খন্না ও ইয়তে ২০০৭)। অন্যান্য উদীয়মান অর্থনীতিতেও ব্যবসায় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে। তবে কিনা পরিবারকেন্দ্রিক গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্থার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠীর ইউনিটগুলি বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে। কিন্তু ঝুঁকির ভাগ বহন করে সমবেতভাবে। সহায়সম্পদ এবং তথ্যভাণ্ডারও যৌথ সম্পত্তি। শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ বাবদ বিনিয়োগ করে একযোগে। উন্নত দেশে ঝুঁকি বহন ও পরিকল্পনা তৈরিতে সাহায্য করতে আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সেখানে মূলধন বাজার যথেষ্ট উন্নত। ভারতের মতো বিকাশশীল দেশ এক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে। সেই খামতি মেটায় ব্যবসায় গোষ্ঠী।

সেকাল থেকে বর্তমান যুগ ইস্তক ভারতে এক অনন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বহাল। উদ্যোগীদের দক্ষতা সৃজনে এই শিক্ষার ব্যবস্থার অবদানও হেলাফেলার নয়। তীর্থঙ্কর রায় (২০১১)-এর কথায় ঔপনিবেশিক রাজত্বকালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল জাতপাত চালিত—"কিছু জাতের লোকজন বংশপরম্পরায় লেখাপড়া চর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিল। শিক্ষার চাহিদাও তাই ঠিক করা হত এসব জাতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে। আগে পুঁথিপাঠ, লিপিলিখন, ভেষজবিদ্যা, গুরুগিরি ও পুরুতগিরিতে লেগে থাকা শ্রেণির মানুষ ইংরেজ আমলে শিক্ষা, চিকিৎসা ও সরকারি প্রশাসনে ঠাঁই করে নিল। নতুন স্কুল-কলেজি

*ভারতীয় পোলট্রি সংস্থা ভেঙ্কি-র ইংল্যান্ডে ব্ল্যাকবার্ন রোভার্স ফুটবল ক্লাবের মালিক হওয়া এই সহজাত প্রবৃত্তি ও মুনশিয়ানার এক নজির। এই ক্লাব কেনার সঙ্গে ভেঙ্কির ম্যানেজারদের ফুটবল নিয়ে জ্ঞানগম্যির তিলেক সম্পর্কও নেই।

শিক্ষাকে সোৎসাহে কাজে লাগাল এরা। অন্যান্য শ্রেণি এবং জাতের কিছু লোকও নতুন শিক্ষা নিতে আগ্রহ দেখায়। তবে তারা নেহাতই মুষ্টিমেয়। শুধু কি তাই। ইস্কুল-পাঠশালার আঙিনা ছাড়তেও এদের অনেকে কালক্ষেপ করত না। বংশপরম্পরায় লেখাপড়ার পেশায় নিযুক্তি, চাকরিবাকরির প্রতি ঝোঁক, আর তাই শিক্ষায় উৎসাহ—এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্ক সবচেয়ে জোরালো ছিল তিন বন্দর নগরী মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায়।" শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল জাতপাতভিত্তিক। শিক্ষা ব্যবস্থায় ছড়িদারি চালাত চাকরিতে আগ্রহী লোকজন। প্রাথমিক পাঠ শেষে উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিত উঁচু জাতের পড়ুয়ারা। তাদের চাওয়া-পাওয়ার দিকে সিস্টেমের খেয়াল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল দুয়োরানি। তার জন্য বরাদ্দ খুদকুঁড়ো। একরাশ উপেক্ষা অবহেলা। জাতপাতভিত্তিক এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকরি ও কলমপেষা পেশা। দেশে আজ পরিষেবা অর্থনীতি ও সফটওয়্যারের বাড়বাড়ন্তের পিছনকার ইতিহাস এটাই। বিদেশেও এই দু'ক্ষেত্রে ভারত মোটা অঙ্কের লগ্নি করছে।

আমেরিকা ও ব্রিটেনে বহু জন্মসূত্রে ভারতীয়ের বসবাস। এটাও ভারতীয় সংস্থার ম্যানেজারি দক্ষতা বৃদ্ধির একটা কারণ। গত দশকের শেষদিকের তথ্যমাফিক ব্রিটেনে ছিল ১৬ লক্ষ ভারতীয়। অর্থাৎ সে দেশের জনসংখ্যার ১.৮ শতাংশ। আমেরিকায় সে সময় বাস করত ২৮ লক্ষ ভারতীয়। যা কিনা সেখানকার জনসংখ্যার ০.৯ শতাংশ। আমেরিকা ও ব্রিটেনে ভারতীয় পেশাদারদের অনেকে বেশ প্রতিষ্ঠিত। দেবেশ কপুর (২০১০) এদের বলেছেন 'নামডাকওয়ালা মধ্যবর্তী'; এরা বিদেশি এবং ভারতীয় সংস্থার মধ্যে মধ্যবর্তীর ভূমিকা পালন করে। জগদীশ ভগবতীর (১৯৭৪) ভাষায় এরা 'ঘুরে ফিরে আসে যায়'। ঘন ঘন এদের ভারতে দেখতে পাবেন। দু'দেশেই আছে এদের ব্যবসায়িক স্বার্থ। এর মোদ্দা ফল—ভারতীয় সংস্থার ব্যবস্থাপনায় বাড়ে উৎকর্ষ। বিশেষ করে অর্থসংস্থান, বিপণন সংক্রান্ত তথ্য ও সফটওয়্যারের মতো পরিষেবা ক্ষেত্রে।

বিদেশে ভারতীয় লগ্নির তাক-লাগানো বাড়-বাড়ন্তের জন্য ভিন গোত্রের দুটি ব্যাখ্যার কথাও বলা দরকার। এক, দেশের তুলনায় বিদেশের বাণিজ্য পরিবেশে কারবার চালানো হয়তো সহজ। সরকারি নিয়ামক ব্যবস্থার গদাইলশকরি চালে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আশাভঙ্গের কথা সংবাদ মাধ্যমে ইদানীং চাউর হয়েছে। এমনকী আমলাদের সঙ্গে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলে কাজ হাসিলে পটু (যাদের বলা হয় বলির্গাচ) ব্যবসায়ীরাও হতোৎসাহ (ক্র্যাবট্রি ২০১২)।

দুই, বিদেশি বাজারের আকর্ষণ। এ ব্যাপারে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ইদানীংকার ভারতের মিল আছে। ১৮৭০-১৯১৪-তে ব্রিটেন থেকে অনেক মূলধন সরে যায় মূলত উপনিবেশগুলিতে। ১৯১৪-য় বিদেশে খাটছিল ব্রিটেনের ২০০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের মূলধন। সে সময় খোদ ব্রিটেনে বেকারি বাড়ছে হুহু করে। বিদেশ বাণিজ্যে মোটা ঘাটতি। তা সত্ত্বেও মূলধন রপ্তানিতে ভাটা পড়েনি। রপ্তানির আয় দিয়ে উপনিবেশগুলি ধারের আসল ও সুদ শোধ দিত। আর উপনিবেশ থেকে আমদানি করা কাঁচামালের দাম ব্রিটেন মেটাত বিদেশে পাঠানো মূলধন বাবদ আয় থেকে। এ বিষয়ে ফের বিতর্ক মাথাচাড়া দেয় বিশ শতকে আটের দশকে। এক পক্ষের মতে ব্রিটেনের মূলধন বাইরে যাবার কারণ দেশের তুলনায় তখন বিদেশ থেকে এ বাবদ লভ্যাংশ বেশি মিলত, ঝুঁকি ছিল কম (টেমিন ১৯৮৭)। বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য, অভ্যন্তরীণ বাজারে হরেকরকম অপূর্ণাঙ্গতা বা ত্রুটিবিচ্যুতি এর জন্য দায়ী (পোলার্ড ১৯৮৫, বালাসুব্রমনিয়াম ১৯৮৯)। ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ বাজারে কাঠামোগত অনড়তা, ট্রেড ইউনিয়নের দাপট, চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চটজলদি পেশা বদলাতে অনিচ্ছা ইত্যাদি অপূর্ণাঙ্গতা বা খুঁতের দরুন মূলধন সরে যায়। আজকের ভারতীয় অর্থনীতির হালও সেরকমই। এটা ভারতীয় সংস্থার বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নি বাড়ার কারণ হয়তো।

সংক্ষেপে বলা যায়, ভারতীয় উদ্যোগীরা বিদেশে লগ্নির ক্ষমতা রাখে। এই সামর্থ্য বা দক্ষতা তারা অর্জন করেছে বংশপরম্পরায়। সেই ঔপনিবেশিক জমানা থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দক্ষতা সুবিদিত। স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মানব সম্পদের উৎকর্ষ বুক বাজিয়ে বলার মতো। তিন দশকের বেশি জুড়ে চলা লাইসেন্স রাজে এসব দক্ষতা শিকেয় তুলে রাখা হয়েছিল। ১৯৯১ ইস্তক তা কাজে লাগানোর জো মেলেনি। অবশেষে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর খাঁচাবন্দি বাঘ মুক্তির স্বাদ পেল। টুটে গেল নিয়মকানুনের বেড়াজাল। ঝুঁকি নেবার উপযোগী বাতাবরণের ব্যবস্থা হল। এক অভিন্ন বিশ্বে বুক চিতিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মহড়া নেবার পথ এখন খোলা।

বিদেশে প্রত্যক্ষ লগ্নির ক্ষেত্রে আর দু-পাঁচটা উদীয়মান অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের ফারাক স্পষ্ট। বিদেশে ভারতের লগ্নির বাড়বাড়ন্তের একটা মস্ত কারণ এদেশ যুগ যুগ ধরে পেয়েছে সহজাত ব্যবসায়িক বিচক্ষণতার অধিকারী উদ্যোগী শ্রেণি। উদীয়মান অন্যান্য অর্থনীতিতে এটা দেখা যায় না। এই নিবন্ধে ভারতে সহজাত ব্যবসায়িক প্রতিভাসম্পন্ন উদ্যোগী শ্রেণির উদ্ভবের কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গত নয়ের দশকে ব্যবসায়িক উদ্যোগে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি, বাধানিষেধ রদ করায় উদ্যোক্তাদের সহজাত প্রবৃত্তি কাজে লাগার সুযোগ খুলে গেছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতিতে ঠাঁই করে নিতে তারা এখন উৎসুক। সংগঠন, লগ্নি ও বিপণন সুযোগ শনাক্ত করা এবং উদ্যোগ প্রতিভায় বিদেশে বিনিয়োগকারী ভারতীয় সংস্থাগুলির বেশ কিছু সুবিধা আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে কারবার চালাতে তা বেশ কাজে লাগে। এসব এবং অন্যান্য গুণ (নিবন্ধে উল্লেখিত) পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়। এ নিয়ে আরও গবেষণা চালানো দরকার।❑

[ভি. এন. বালাসুব্রমনিয়াম 'ল্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট স্কুল' এবং নিকোলাস ফরসাঁস 'এক্সেটার বিজনেস স্কুল'-এ অধ্যাপক।
Email:
v.balasubramanyam@lancaster.ac.uk]

ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

নীতি পরিবর্তন এবং রাজ্যভিত্তিক বৈচিত্র

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে ভারতীয় নীতির পর্যালোচনা ও ক্রম পরিবর্তন এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন লেখক **সজিন শিন।** *বর্তমানে এ বিষয়ে কেন্দ্রের অনুকূল মনোভাব সত্ত্বেও রাজ্যভেদে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণগত ফারাক এতটা বেশি কেন, উদাহরণ সহযোগে রয়েছে তারও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ রয়েছে এই নিবন্ধে।*

কোনও একটি অর্থনীতির অন্তর্গত কোনও সংস্থা যখন সীমান্ত পেরিয়ে অন্য কোনও অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত কোনও সংস্থায় দীর্ঘকালীন স্বার্থে বিনিয়োগ করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বলা হয় (OECD, ২০১৩)। অন্যভাবে বললে ভারতের সাপেক্ষে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বলতে বোঝায়, 'ভারতের বাইরে থাকা কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার কোনও ভারতীয় সংস্থায় মূলধনে বিনিয়োগ' (ভারত সরকার)। শুধু সম্পত্তির মলিকানাই নয়, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যেখানে লগ্নি করেছেন, সেই সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেন। এই দুটি বৈশিষ্ট্য, দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ এবং পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাপক রাষ্ট্রের নিরিখে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে বেশি সুফলদায়ক মনে করা হয়। অন্যদিকে portfolio investment বা শেয়ার বাজারে বিদেশি লগ্নি সাধারণত স্বল্পমেয়াদি হয়। অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সম্পর্কে অনুকূল ও প্রতিকূল, দুটি পরস্পরবিরোধী দিকই রয়েছে। তবে বহু বিকাশশীল বাজার অর্থনীতিই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুফল ভোগ করেছে (মর্গ্যান, ১৯৯৮)।

গত দুই দশকে ভারত ও চীনের মতো বিকাশশীল বাজার অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমশই বেড়েছে। (UNCTAD, ২০১০)। বিনিয়োগের পছন্দসই গন্তব্য হিসাবে চীন বর্তমানে শীর্ষে, ভারতের স্থান তৃতীয় (UNCTAD, ২০১৩)। নীতিগত পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক পদ্ধতির সরলীকরণের মাধ্যমে এই দুটি অর্থনীতি সক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। এই সক্রিয়তা এসেছে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, মূলধনি দ্রব্য ও সুবিধা প্রদান করা, উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রযুক্তি হস্তান্তর, পরিচালন ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সংস্থার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, দেশীয় বিনিয়োগকে উৎসাহ জোগানো প্রভৃতি এই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এশীয় উন্নয়নের মডেল হিসাবে যে রাষ্ট্রগুলিকে ধরা হয়, সেই দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং, সিঙ্গাপুরের মতো দেশগুলি দেখিয়েছে, কীভাবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক বিকাশ সুনিশ্চিত করা সম্ভব। এছাড়া ম্যাক্রো অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা মজুত রাখায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুবাদে 'দেশীয় মুদ্রার মূল্যের আকস্মিক অবনমন এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে আপৎকালীন ঋণ নিতে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না' (ক্রুগার অ্যান্ড ইটো, ২০০০ : ৭)।

ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তন

সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন বিশ্ব বাজারের সঙ্গে ভারতীয় বাজার সংযুক্ত হল, তখন থেকেই ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সমর্থনকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে (মুখার্জি, ২০১৪)। নীতিগত অবস্থানের দিক থেকে দেখলে ভারতে তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ করা যাবে। (১) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বিরোধিতা (১৯৬৯-৭৫)। (২) নির্বাচিত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো (১৯৭৫-৯১) এবং (৩) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অনুকূল পরিবেশ (১৯৯১ পরবর্তী সময়কাল)। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বিরোধিতার যুগে ১৯৬৯ সালে দরিদ্র মানুষের রাজনৈতিক সমর্থন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশীয় ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ করা হয়েছিল। এছাড়া বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে চালু করা হয় বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন—FERA। এই আইনের সুবাদে বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিনিধি রিজার্ভ ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনও সংস্থার বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত কাজকর্মে যোগদানের অধিকারই ছিল না। 'নির্বাচিত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ'-এর যুগে ভারতীয় অর্থনীতিতে বিধিনিয়ম শিথিল করা শুরু হয়। সরকার ভারতীয় শিল্পে বিদেশি মূলধনের অনুপ্রবেশকে উৎসাহ জোগাতে থাকে। ১৯৭৬ সালটি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ সেই বছরই ভারতীয় অর্থনীতি এক নতুন দিকে মোড় নেয়। ফ্র্যাঙ্ক (১৯৭৭) বলছেন, 'অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ও রাজনৈতিক স্বার্থের

থেকেও মূলত বৃহৎ ও বিদেশি পুঁজিকে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাবার জন্য রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করা হয়েছিল (পৃষ্ঠা-৪৭৩)।

রাজীব গান্ধীর সরকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সমর্থনে এগিয়ে আসায় ভারতের অবস্থানগত এই পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আটের দশকের গোড়ায় তেলের মূল্যবৃদ্ধি-জনিত সংকট এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার সময়ে রাজীব গান্ধী বিদেশি ঋণ গ্রহণের থেকে বিদেশি বিনিয়োগের তুলনামূলক সুবিধা উপলব্ধি করেন। তিনি বলেন, 'বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে আমাদের নীতি স্পষ্ট। খোলা দরজা নীতি নয়। আমরা আমাদের নিজস্ব শর্তে বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দেব। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি পুঁজি নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষেত্র বা রপ্তানিতে বিশেষ অবদানের সুযোগ যেখানে রয়েছে, সেখানে এই হার শিথিল করা যেতে পারে।.....গত কয়েক বছরে বিদেশ থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বেড়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের বাড়তে থাকা চাহিদা ও গ্রহণক্ষমতা প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ খুবই সামান্য। অথচ বিদেশি ঋণের তুলনায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। ঋণের অর্থ লগ্নি করে লাভ হোক বা না হোক, নির্দিষ্ট সময় পর ঋণ ফেরত দিতে হবে। অন্যদিকে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে লাভ হলে তবেই লাভের একটা অংশ বিদেশে ফেরত যাবে।.....পদ্ধতি-সমূহকে দ্রুততর এবং অপ্রয়োজনীয় বিধিনিষেধকে তুলে দিয়ে আমাদের অর্থনীতির স্বার্থে আমরা আরও বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারি।'

শেষপর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলায় নয়ের দশকের গোড়ায় এল নতুন আর্থিক নীতি। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের যুগ শুরু হল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সময়কালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী একটি নীতিনির্দেশিকা প্রস্তুত করেছিলেন, যা অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল দলিল হিসাবে গৃহীত হয়ে ১৯৯১ সালে রূপায়িত হল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশীয় কোম্পানিগুলির মূলধনে বিদেশি পুঁজির ঊর্ধ্বসীমা ৪০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫১ শতাংশ করার প্রস্তাব এই দলিলে ছিল। লেনদেন খাতের জের সংক্রান্ত সঙ্কটের মোকাবিলায় আনা এই নীতিগত পরিবর্তন, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করল (মুখার্জি, ২০১৪ বি)।

এই সময়ের সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনগুলির মধ্যে অন্যতম হল FERA-র বদলে ১৯৯৯ সালে বিদেশি মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন—FEMA-র প্রবর্তন। ১৯৭৩ সালের FERA-য় শুধুমাত্র রিজার্ভ ব্যাংককে বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। FEMA-য় রিজার্ভ ব্যাংকের পাশাপাশি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া SEBI-কেও এই অনুমোদন দেওয়া হল। SEBI ও রিজার্ভ ব্যাংক মূলত বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের বিষয়টি খতিয়ে দেখে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পর্যালোচনা হয় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতেই, এজন্য আগাম অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। অন্যথায় প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাব কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন শিল্প সহায়তা সচিবালয় (Secretariat for Industrial Assistance—SIA) এবং অর্থমন্ত্রকের অধীন বিদেশি বিনিয়োগ উন্নয়ন পর্ষদের (Foreign Investment Promotion Board—FIPB) কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। FEMA কার্যকর হবার পর থেকে বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদনের ক্ষেত্রে FIPB-র গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। FIPB-র এক জানালা ব্যবস্থায় বিদেশি বিনিয়োগকারীরা লাল ফিতের ফাঁস এড়িয়ে দ্রুত রাজ্যস্তরের সংস্থাগুলির কাছে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, কার্যকর ও সরল শাসন পদ্ধতির ওপর জোর দিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানের ডাক দিয়েছেন। ভারতকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সামনে গ্লোবাল হাব হিসাবে তুলে ধরার স্বপ্ন তাঁর দু'চোখে। FDI-কে 'First Develop India' আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'সুশাসনের তিনটি স্তম্ভ হল—লাইসেন্স ও বিধিনিয়মের বেড়া শিথিল করে ব্যবসার ক্ষেত্র সহজ করা, শিল্প করিডোরের মতো বিভিন্ন পরিকাঠামো নির্মাণ এবং প্রতিরক্ষা, নির্মাণ, রেলের মতো ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।' এছাড়া বিমান পরিবহণ, জৈবপ্রযুক্তি, রাসায়নিক, খনি, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস, ওষুধ প্রস্তুত, পুনর্নবীকরণ শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রকেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ, ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে বর্তমান সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের রাজ্যভিত্তিক বৈচিত্র

২০১১ সালে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের মোট পরিমাণ ছিল ৩২০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি, যা ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন GDP-র প্রায় ৩ শতাংশ (UNCTAD, ২০১৩)। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর মতো শীর্ষস্তরীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এই ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কারের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণে বিপুল তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সারণি-১-এ কয়েকটি রাজ্যে ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত সময়কালে হওয়া প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ দেখানো হল। এই সারণি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অর্ধেকই হয়েছে মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ রয়েছে মাঝামাঝি অবস্থানে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার মতো রাজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনয়োগের পরিমাণ খুবই সামান্য।

এখন প্রশ্ন হল, কেন এই তারতম্য? কেন্দ্রীয় স্তরে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ অনুকূল নীতির ওপর ধারাবাহিক জোর সত্ত্বেও কেন কয়েকটি রাজ্যে এই বিনিয়োগ আসছে এবং অন্য রাজ্যগুলিতে আসছে না?

লক্ষ করার বিষয় হল, ওড়িশার মতো যেসব রাজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের

পরিমাণ অত্যন্ত কম, সেখানে এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী এক সামাজিক প্রতিরোধও গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে দক্ষিণ কোরীয় সংস্থা POSCO-র কথা বলা যায়। জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ওড়িশার জগৎসিংপুরে তাদের কঠিন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের অনুরোধে একটি কমিটি POSCO প্রকল্পে বিদেশি অধিকার আইনের (Foreign Rights Act—FRA) পালন সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত চালায়। তাতে দেখা গেছে, জমি অধিগ্রহণের আগে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সহমত গড়ে তোলার কোনও প্রয়াস ওড়িশা সরকার করেনি। (পিঙ্গলে, পান্ডে ও সুরেশ, ২০১০ : ৩-৫)। তদন্ত প্রক্রিয়াকে মনোযোগ দিতে খতিয়ে দেখার পর মাদ্রাজ হাইকোর্টের এক বিচারপতি বলেছেন, POSCO-র বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সামাজিক প্রতিরোধ ক্রমশ দানা বাঁধে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিপর্যয়ের কারণে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে টাটা গোষ্ঠীকে একইরকম প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুরে। দেশীয় বিনিয়োগকারী হলেও টাটাকে ন্যানো গাড়ি তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ নিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তাতে রাজ্য সরকার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ও জমির মূল্য নির্ধারণে কতটা অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, তা স্পষ্ট (চন্দ্র, ২০০৮)। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিরোধের সন্তোষজনক সমাধান ও কার্যকর সুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বিভিন্ন রাজ্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেও প্রশাসনিক দক্ষতা ও সামাজিক বিরোধিতার নিষ্পত্তির ওপর তাদের সাফল্য নির্ভর করে। এক্ষেত্রে রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতগত বিভিন্নতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।❑

সারণি-১
রিজার্ভ ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়ে জমা পড়া প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিবরণী
(এপ্রিল ২০০০—জুন ২০১৪)

রিজার্ভ ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়	সুফলভোগী প্রধান রাজ্য	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)	সার্বিক বিনিয়োগের সাপেক্ষে শতকরা হার
মুম্বই	মহারাষ্ট্র	৩,২০,২৮১	৩০
নতুন দিল্লি	দিল্লি	২,১৪,৮২০	২০
চেন্নাই	তামিলনাড়ু	৬৯,১৬১	৬
বেঙ্গালুরু	কর্ণাটক	৬২,৪৩১	৬
আমেদাবাদ	গুজরাট	৪৫,২৯২	৪
হায়দরাবাদ	অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৩,৮১৭	৪
কলকাতা	পশ্চিমবঙ্গ	১৩,৫৩২	১
ভুবনেশ্বর	ওড়িশা	১,৯৬২	০.২

সূত্র : 'Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI)', ভারত সরকার।

[লেখক সিঙ্গাপুরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ'-এ গবেষণা করছেন। তাঁর গবেষণার মূল বিষয় ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও রাজ্য রাজনীতি।]

ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আঞ্চলিক বৈষম্য

একটি সমীক্ষা

*কোনও দেশের আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি ঋণ বহির্ভূত আর্থিক মূলধন হওয়ায় অন্যান্য মূলধনি পুঁজির মধ্যে একেই সবসময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই বিনিয়োগ টানতে বিভিন্ন দেশ, বা একই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে প্রতিনিয়ত। কখনও ভরতুকি হারে জমি, জলের ব্যবস্থা করে, কখনও বা আন্তঃশুল্কে ছাড় দিয়ে আবার কখনও বা সম্পত্তি কর আদায় মুলতুবি রেখে বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব দেশে বা একটি দেশের সব অঞ্চলে সমানভাবে এই বিনিয়োগ আসে না। কিন্তু কেন? কেনই বা ভারতে আসা মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৭০ শতাংশ মাত্র ছয়টি রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে? কোন কোন বিষয় এই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে? তারই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***ড. এস আর কেশব।**

বিশ্বের সমস্ত দেশেই অন্যান্য সব মূলধনি পুঁজির মধ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কেননা এটা ঋণ বহির্ভূত আর্থিক মূলধন। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফ ডি আই) আহ্বায়ক অর্থনীতিতে বিনিয়োগের হার বাড়ায় যার গুণক প্রভাবে সেই দেশে কর্মসংস্থান, আয় ও সঞ্চয়ের হারও বাড়ে। এর ফলে আহ্বায়ক অর্থনীতিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বশেষ প্রযুক্তি, দক্ষতা, পরিচালনার জ্ঞান যেমন আসে তেমনি উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবার রপ্তানি বাড়ে। এর ফলে বিভিন্ন সংস্থা উপভোক্তাদের কাছে যথাযথ গুণমানসম্পন্ন পণ্য তুলে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নামায় উপভোক্তাদের সামনে নিজেদের পছন্দমতো পণ্য বেছে নেওয়ার প্রচুর সুযোগ থাকে। প্রতিযোগিতার পরিবেশ দেশীয় বাজারে একচেটিয়া কারবারের অবসান এবং দ্রব্যমূল্য কমাতে সাহায্য করে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বায়ক অর্থনীতিগুলিতে কর্পোরেট কর রাজস্বের পরিমাণও বাড়ায়।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ইতিবাচক দিকগুলি তত্ত্বগত দিক থেকে একদম ঠিক, কিন্তু বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে এই কথাগুলো পুরোপুরি ঠিক নয়, আংশিক সত্যি। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সবসময় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও আনে না আবার প্রতিশ্রুতি মতো কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করে না। তবে অনেক অর্থনীতিই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ইতিবাচক দিকগুলি দেখে খুব বেশি প্রভাবিত হয়।

এই বিনিয়োগ টানার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে নানারকম ছাড় বা সুযোগ-সুবিধার কথা ঘোষণা করেছে। এই বিনিয়োগ টানার জন্য তারা যে শুধু ভরতুকি হারে জমি, জল, বিদ্যুৎ বা অন্যান্য সরকারি পরিষেবা দিচ্ছে তাই নয়, সেই সঙ্গে কর ছুটি, অবণ্টিত মুনাফার ওপর ছাড়, অতিরিক্ত অবচয় পূরণের সংস্থান (অ্যাডিশনাল ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাওয়েন্স)-এর মতো নানারকম ছাড়ও দিচ্ছে।

আহ্বায়ক অর্থনীতিগুলির এই বিপুল বহরের ছাড় ও সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও সব অর্থনীতিতে সমানভাবে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসে না। দেখা যাবে যে হাতে গোনা কয়েকটি অর্থনীতিতেই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ, যার ফলে বিশ্বে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বণ্টনের ক্ষেত্রে একটা বড় আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দিয়েছে। ভারতের রাজ্যগুলিতেও ঠিক একই চিত্র। এখানেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে বড়সড় আঞ্চলিক বৈষম্য।

অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি

এ দেশের কয়েকটি রাজ্যে বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগমনের কারণে আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়েছে। এর কারণটা নিহিত রয়েছে সেই বিষয়ের মধ্যে যা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আসার ক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারকারী বিষয়গুলির মধ্যে বাজারের আয়তন ও তার বিকাশের সম্ভাবনা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুস্থিতি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ ও নৈকট্য, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানব সম্পদের জোগান ও বেতন কাঠামো এবং শিল্প ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে চিহ্নিত করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ নিগম (২০০১)।

আবার ডানিং-এর সমীক্ষা (১৯৯৩) প্রমাণ করেছে যে আরও বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার জন্য বাজারের

আয়তন, শ্রমমূল্য, প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান, ব্যবহারিক ও মানবিক পরিকাঠামোর গুণমান, বিভিন্ন উৎসাহদান প্রকল্প, বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিবেশ, সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিবেচনাই গুরুত্ব পায়।

অন্যদিকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেন ট্রেড প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে প্রধান যে নির্ধারকগুলিকে চিহ্নিত করেছে সেগুলি হল—(১) সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা (২) পরিকাঠামো (৩) শিল্পক্ষেত্রে অনুকূল সম্পর্ক (৪) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনী (৫) সামাজিক পরিকাঠামোর জোগান (৬) বিনিয়োগকারীদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ (৭) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (৮) সময়মাফিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ছাড়পত্র ও অনুমোদন (৯) আমলাতন্ত্রের ন্যূনতম নিয়মকানুন (১০) সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন ছাড়।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগিতা

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বিকাশ প্রক্রিয়ায় গতি আনবে এই বিশ্বাস নিয়ে এ দেশের বেশিরভাগ রাজ্যই বিভিন্ন ধরনের ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করে এই বিনিয়োগ টানার চেষ্টা করছে। এই সব সুযোগ সুবিধার মধ্যে রয়েছে ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ; বিক্রয়কর এবং অন্তঃশুল্কে ছাড় এবং কর মুলতুবি প্রকল্প, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য পরিষেবার জন্য কম মূল্য আদায়; কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তি কর হ্রাস বা এই কর থেকে ছাড় ইত্যাদি।

রাজ্যগুলি প্রায়শই গুরুত্বপ্রাপ্ত শিল্পগুলিকে চিহ্নিত করে ব্যবসা শুরু করার জন্য তৈরি পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে থাকে। আর এর ফলেই বিভিন্ন শিল্প, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য-প্রযুক্তি পার্ক গড়ে ওঠে। রাজ্যগুলি আবার জমির নথিভুক্তিকরণ থেকে শুরু করে অন্যান্য অনুমতির জন্য 'একক জানালা' (সিঙ্গল উইন্ডো) ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে। আইন মেনে চলার পথ সুগম করা তথা দুর্নীতি কমানো ও পুরো প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতায় আনতে রাজ্যগুলি কার্যপ্রণালীর সরলীকরণও ঘটিয়েছে।

ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগমনের ক্ষেত্রে ভারতের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এখনও বিরাট বৈষম্য রয়ে গেছে। ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণের বিচারে এ দেশের রাজ্যগুলিকে এই নিবন্ধের লেখক 'উচ্চ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের রাজ্য', 'মাঝারি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের রাজ্য' ও 'নিম্ন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের রাজ্য' এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন (সারণি-১)। ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ মূলত ছয়টি রাজ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন মহারাষ্ট্র, নয়া দিল্লি, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশ। ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত এই ছয়টি রাজ্যে পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৯৩৬৪১ কোটি টাকা যা সারা দেশের, মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৭০ শতাংশ। ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত শুধু মহারাষ্ট্রেই এ দেশের মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৩০ শতাংশ (৩২০২৮১ কোটি টাকা) এসেছে। মহারাষ্ট্রের মধ্যে মুম্বইতেই অধিকাংশ বিনিয়োগ এসেছে। তাই মুম্বই শুধু এ দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নয়, এ দেশের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের রাজধানীও বটে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অঙ্কের নিরিখে মহারাষ্ট্রের পর ২১৪৮২০ কোটি টাকা (২০ শতাংশ) নিয়ে রয়েছে নয়া দিল্লি, ৬৯১৫১ কোটি টাকা (৬ শতাংশ) নিয়ে রয়েছে তামিলনাড়ু, ৬২,৪৩১ কোটি টাকা (৬ শতাংশ) নিয়ে রয়েছে কর্ণাটক, ৪৫,২৯২ কোটি টাকা (৪ শতাংশ) নিয়ে রয়েছে গুজরাট এবং ৪৩,৮১৩ কোটি টাকা (৪ শতাংশ) নিয়ে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা।

২০০০-এর এপ্রিল থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত যে সমস্ত রাজ্য ৪৫০০ কোটি টাকা থেকে ৪০,০০০ কোটি টাকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানতে পেরেছে সেই রাজ্যগুলিকে মাঝারি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই শ্রেণির রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও কেরল।

আবার, ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৪-এর জুন পর্যন্ত যে সমস্ত রাজ্যে ৪৫০০ টাকার কম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে সেই সমস্ত রাজ্যকে নিম্ন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে গোয়া, ওড়িশা, আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্য।

দেখা যাবে যে কোনও রাজ্যের বেশিরভাগ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগই কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানী শহরে। একটা বিষয় স্পষ্ট যে কর ও অন্যান্য আর্থিক ছাড় সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ দেশের হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্য, বরং বলা ভালো এই রাজ্যগুলির কয়েকটি শহরেই সীমাবদ্ধ। এই অসাম্যের কারণ খুঁজে বের করতে গেলে এই রাজ্যগুলির বৃহত্তর অর্থনৈতিক সূচকগুলি বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণসমূহ

ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে অঞ্চলগত বৈষম্যের কারণ অনেক। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বিশাল বাজার, দক্ষ কর্মীর জোগান, আর্থিক বিকাশ, উন্নত পরিকাঠামো, আর্থিক বিষয়ে বেশি স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য করার পরিবেশ।

জনঘনত্ব, সাক্ষরতা ও উচ্চশিক্ষায় নথিভুক্তি এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

বিপুল জনসংখ্যাসম্পন্ন বিশাল বাজার, সাক্ষর ও দক্ষ কর্মীর জোগান, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা—এই সবকিছু বিচার করেই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসে (সারণি-২)। কিছু শিক্ষার্থী নিজেদের শিক্ষার জন্য অন্য রাজ্য

সারণি-১				
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নিবন্ধিত কার্যালয়	**সমীক্ষায় আওতাভুক্ত** রাজ্যসমূহ	**২০১৩-১৪ এপ্রিল-মার্চ (কোটিতে টাকার অঙ্ক)**	**পুঞ্জীভূত বিনিয়োগ এপ্রিল-২০০০ জুন-২০১৪ (কোটিতে টাকার অঙ্ক)**	**মোট বিনিয়োগের শতাংশের হিসেবে**
উচ্চ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ				
মুম্বই	মহারাষ্ট্র, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ	২০,৫৯৫	৩২০,২৮১	৩০
নয়াদিল্লি	দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার অংশবিশেষ	৩৮,১৯০	২১৪,৮২০	২০
চেন্নাই	তামিলনাড়ু, পণ্ডিচেরী	১২,৫৯৫	৬৯,১৬১	৬
ব্যাঙ্গালোর	কর্ণাটক	১১,৪২২	৬২,৪৩১	৬
আহমেদাবাদ	গুজরাত	৫,২৮২	৪৫,২৯২	৪
হায়দরাবাদ	অন্ধ্রপ্রদেশ	৪,০২৪	৪৩,৮১৭	৪
মাঝারি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ				
কলকাতা	পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২,৬৫৯	১৩,৫৩২	১
জয়পুর	রাজস্থান	২৩৩	৬,৩৬০	০.৬
চণ্ডীগড়	চণ্ডিগড়, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ	৫৬২	৬,১৪৮	০.৬
ভোপাল	মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়	৭০৮	৫,৫৯৫	০.৫
কোচি	কেরল, লাক্ষাদ্বীপ	৪১১	৪,৮৭৫	০.৪
নিম্ন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ				
পানাজি	গোয়া	১০৩	৩,৬৬০	০.৪
ভুবনেশ্বর	ওড়িশা	১৮৮	১,৯২৬	০.২
কানপুর	উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল	১৫০	১৯৬২	০.২
গুয়াহাটি	আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা	৪	৩৫২	০
পাটনা	বিহার, ঝাড়খণ্ড	৯	২২৮	০
অনুল্লেখিত অঞ্চল		৫০,২৮৩	২৮৬,৬০৪	২৬
মোট		১৪৭,৫১৮	১,০৭৬,০৯৩	১০০ শতাংশ
তথ্যসূত্র : এস ই এ ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সংকলিত।				

বা বিদেশে গেলেও বেশিরভাগই নিজেদের রাজ্যেই পড়াশোনা করে থাকে।

বিপুল জনসংখ্যাবিশিষ্ট বিশালায়তন বাজার থাকলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার কাজ সহজ হয়। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করেন উত্তরপ্রদেশে (১৬.৪৯ শতাংশ, কিন্তু দেশের মধ্যে এ রাজ্যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ নগণ্য)। একই চিত্র বিহার (৪.৫৮ শতাংশ) ও রাজস্থানেও (৬.৬৯ শতাংশ)। অথচ, বিপুল জনসংখ্যার সুফল পেয়েছে মহারাষ্ট্র (৯.২৯ শতাংশ)। জনসংখ্যার বিচারে মহারাষ্ট্রের স্থান এ দেশে দ্বিতীয় এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অঙ্কের বিচারে এই রাজ্য প্রথম। উচ্চ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের প্রাপক অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে তামিলনাড়ু (৫.৯৬ শতাংশ), কর্ণাটক (৫.০৫ শতাংশ) এবং গুজরাট (৪.৯৯ শতাংশ) মাঝারি জনঘনত্ববিশিষ্ট রাজ্য। আর ব্যতিক্রম হল দিল্লি (১.৩৮ শতাংশ) এবং পণ্ডিচেরী (০.১০ শতাংশ)। এক রাজ্যে উৎপাদিত পণ্য ও পরিষেবা অনায়াসে দেশের অন্য রাজ্যে পৌঁছে যেতে পারে। তাই প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে রাজ্যের জনসংখ্যা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

প্রতি বর্গকিলোমিটার এলাকায় কত সংখ্যক মানুষ বসবাস করেন তা দিয়েই

সারণি-২						
রাজ্য	জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতাংশের হিসাবে	জনঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)	সাক্ষরতা (শতাংশ)	বিশ্ববিদ্যালয় (শতাংশ) (২০১১-১২)	কলেজ (সংখ্যা)	শিক্ষার্থীদের নথিভুক্তি (সংখ্যায়)
উচ্চ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ						
মহারাষ্ট্র	৯.২৯	৩৬৫	৮২.৯১	৪৪	৪৬০৩	১৯৫৫২২৬
দিল্লি	১.৩৮	১১,২৯৭	৮৬.৩৪	২৫	১৮৪	২৭৮৭৭০
তামিলনাড়ু	৫.৯৬	৫৫৫	৮০.৩৩	৫৯	২৩০৯	১৪৮২২৭৭
পণ্ডীচেরী	০.১০	২.৫৯৮	৮৬.৫৫	৪	৮৩	৩৫১২২
কর্ণাটক	৫.০৫	৩১৯	৭৫.৬	৪৩	৩২৮১	১০০১৪৭৩
গুজরাত	৪.৯৯	৩০৮	৭৯.৩১	৩৭	১৮০৫	৮৯৩৬৪৮
অন্ধ্রপ্রদেশ	৭.০০	৩০৮	৬৭.৬৬	৪৭	৪৮১৪	১৮৪৭৪৭৯
মাঝারি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ						
পশ্চিমবঙ্গ	৭.৫৫	১,০২৯	৭৭.০৮	২৬	৮৯৯	৯৪৪০৭৫
রাজস্থান	৫.৬৭	২০১	৬৭.০৬	৪৫	২৬৫২	৭৪৯৪৭৯
চণ্ডীগড়	০.০৯	৯,৯৫২	৮৬.৪৩	৩	২৪	৬৪৫১০
মধ্যপ্রদেশ	৬.০০	২৩৬	৭০.৬৩	৩৩	২০৬১	৯২৮৯৩৯
ছত্তিশগড়	২.১১	১৮৯	৭১.০৪	১৭	৫৩০	৩০৪৩৮১
কেরল	২.৭৬	৮৫৯	৯৩.৯১	১৭	৯৬২	৪০৪১২১
লাক্ষাদ্বীপ	০.০১	২,০১৩	৯২.২৮	০	৩	৪১০
নিম্ন প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ						
গোয়া	০.১২	৩৯৪	৮৭.৪	২	৪৯	২৭৮৭৭০
ওড়িশা	৩.৪৭	২৬৯	৭৩.৪৫	১৯	১০৮৯	৫১০৪১৮
উত্তরপ্রদেশ	১৬.৪৯	৮২৮	৬৯.৭২	৫৮	৪৮৪৯	২৫৬৪৮৮৬
অরুণাচলপ্রদেশ	০.১১	১৭	৬৬.৯৫	৩	২৬	১৬০৬৮
মণিপুর	০.২২	১২২	৭৯.৮৫	৩	৭৯	৩৩৭৫৫
মেঘালয়	০.২৪	১৩২	৭৫.৪৮	১০	৬১	৪১৬৩৩
নাগাল্যান্ড	০.১৬	১১৯	৮০.১১	৪	৫৭	২০০২৬
ত্রিপুরা	০.৩০	৩৫০	৮৭.৭৫	৩	৩৯	৩২৮০০
উত্তরাঞ্চল	০.৮৪	১৮৯	৭৯.৬৩	২০	৩৯৫	২৯৪৪৮৫
আসাম	২.৫৮	৩৯৭	৭৩.১৮	৯	৪৮৫	২৬৮৪৫১
বিহার	৮.৫৮	১,১০২	৬৩.৮২	২০	৬৪৯	৬৯০৭৭৬
ঝাড়খণ্ড	২.৭২	৪১৪	৬৭.৬৩	১২	২৩৪	২৭৪৪৫০
ভারত	১০০	৩৮২	৭৪.০৪	৬৪২	৩৪৯০৮	১৫৯৫৬৪২৮
সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা, আদমশুমারি প্রতিবেদন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে সংকলিত।						

জনঘনত্ব বোঝানো হয়। কোনও এলাকার জনঘনত্ব বেশি হলে শিল্প বা অন্যান্য পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য বিশালায়তন জমি পাওয়ার সম্ভাবনা কমবে। অথচ দিল্লির জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১,২৯৭ হওয়া সত্ত্বেও এখানে বিপুল অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসছে। দেখা যাবে যে দিল্লির শহরতলি এলাকাতেই এই সমস্ত শিল্প গড়ে উঠছে। এই সমস্ত এলাকা খাতায়-কলমে অন্য রাজ্যের সীমানাভুক্ত হলেও কার্যক্ষেত্রে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের অংশ হিসাবেই গণ্য হয়। যেমন নয়ডা এবং গাজিয়াবাদ উত্তরপ্রদেশের অংশ, অন্যদিকে গুরগাঁও, ফরিদাবাদ, বাহাদুরগড় হরিয়ানার সীমানাভুক্ত। বেশি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩০৮ থেকে ৩৫৫-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মাঝারি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলির জনঘনত্ব ১৮৯ থেকে ৯২৫২-এর মধ্যে ঘোরাফেরা

সারণি-৩					
রাজ্য	রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-২০১২-১৩) (কোটিতে) (বর্তমান মূল্যে)	মাথাপিছু রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (পার ক্যাপিটা নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-২০১২-১৩ (টাকায়) (বর্তমান মূল্যে)	রেলপথ ২০১১-১২ (কিলোমিটার)	সড়কের দৈর্ঘ্য (২০১১-১২) (কিলোমিটার)	বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক + দেশীয় (সংখ্যায়) ২০১১-১২
উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ					
মহারাষ্ট্র	১২৩৯১০৪	১০৭৬৭০	৫,৬০২	৪,২৫৭	৩ + ৯
দিল্লি	৩৩২৫২১	১৪২৫৮৭	১৮৩	৮০	১ + ০
তামিলনাড়ু	৬৭১১৯২	৯৮৫৫০	৪,০৬২	৪,৯৪৩	৩ + ৩
পণ্ডীচেরী	১৫৮৮৭	১২২৬৫৪	১১	৫৩	তথ্য নেই
কর্ণাটক	৪৬৬৮১০	৭৭৩০৯	৩,০৭৩	৪,৩৯৬	২ + ৪
গুজরাত	৫৮৪৩৬৭	৯৬৯৭৬	৫,২৭১	৪,০৩২	১ + ৭
অন্ধ্রপ্রদেশ	৬৭৮৫২৪	৭৮৯৫৮	৫,২৬৪	৪,৫৩৭	১ + ২
মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ					
পশ্চিমবঙ্গ	৫৬৭৫৯৪	৬২৫০৯	৩,৯৩৭	২,৬৮১	১ + ২
রাজস্থান	৪১০৮৩৪	৫৯০৯৭	৫,৭৮৪	৭,১৩০	১ + ০
চণ্ডীগড়	২৩২৬১৩	৫০৬৯১	১৬	২৪	১ + ০
মধ্যপ্রদেশ	৩৩৩০১০	৪৪৯৮৯	৪,৯৫৫	৫,০৬৪	২ + ৪
ছত্তিশগড়	১৩১৭৯৬	৫০৬৯১	১,১৮৭	২,২৮৯	০ + ২
কেরল	৩০৯৩৩২	৮৮৫২৭	১,০৫০	১,৪৫৭	৩ + ০
কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ					
গোয়া	২৯৮৮৮	১৬১৮২২	৬৯	২৫৯	১ + ০
ওড়িশা	২১০৬৮৩	৪৯২৪১	২,৪৬১	৩,৭০৪	০ + ৭
উত্তরপ্রদেশ	৬৮৩৬৫১	৩৩১৩৭	৮,৭৬৩	৭,৮১৮	১ + ০
অরুণাচলপ্রদেশ	১১২১৮	৭৮১৪৫	১	২,০২৭	০ + ২
মণিপুর	১০৪৮৯	৩৬৪৭৪	১	২,০২৭	০ + ২
মেঘালয়	১৫৮৮৪	৫৯৫১৭	তথ্য নেই	১, ১৭১	০ + ১
ত্রিপুরা	২২৪৫৩	৬০৯৬৩	১৫১	৪০০	০ + ৩
উত্তরাঞ্চল	৯৯১৫৭	৯৭৫২৮	৩৫৪	২,০৪২	০ + ২
আসাম	১২৬১৪৯	৪০৪৭৫	২,৪৩৪	২,৯৪০	১ + ৩
বিহার	২৮৭১২৯	২৮৭৭৪	৩,৬১২	৪,১০৬	১ + ২
ঝাড়খণ্ড	১৪১৬৪৪	৪৪০৪৫	১,৯৮৪	২,১৭০	০ + ৩
ভারত	৮৩৭২৭৪৪	৬৭৮৩৯	৬৪,৪৬০	৭৬৮১৮	২৪ + ৬৪

সূত্র : অর্থনৈতিক সমীক্ষা এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে সংকলিত।

করছে। আবার যেসব রাজ্যে কম প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে সেই সমস্ত রাজ্যের জনঘনত্বের গড় ১৭ থেকে ১১০২ পর্যন্ত।

এই পরিসংখ্যানে এটা স্পষ্ট যে রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে জনঘনত্বের প্রভাব যৎসামান্য।

সাক্ষরতাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে জ্ঞানের প্রথম সোপান বলে মনে করা হয়। উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলির মধ্যে, একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া (৬৭.৬৬ শতাংশ) অন্যান্য সব রাজ্যের সাক্ষরতার হার সাক্ষরতার জাতীয় গড় হার অর্থাৎ ৭৪.০৪ শতাংশের বেশি। আবার মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড় ছাড়া মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী অন্যান্য রাজ্যের সাক্ষরতার হার জাতীয় গড় হারের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে এমন রাজ্যগুলির মধ্যে ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচলপ্রদেশ,

সারণি-৪
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক—২০১৩

রাজ্য	সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যায়ন		শ্রম ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম		আইনি কাঠামো ও নিরাপত্তা		সরকারের আয়তন	
	সামগ্রিক	স্থান	ক্ষেত্র ৫	স্থান	ক্ষেত্র ২	স্থান	ক্ষেত্র ১	স্থান
উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ								
মহারাষ্ট্র	০.৪২	১১	০.৪৩	৬	০.১৬	১৭	০.৬৮	৩
তামিলনাড়ু	০.৫৪	২	০.৫১	২	০.৫৫	২	০.৫৭	১০
কর্ণাটক	০.৪৩	৯	০.৪৪	৫	০.৩৫	১১	০.৪৯	১৬
গুজরাত	০.৬৫	১	০.৮৭	১	০.৩৯	৪	০.৬৯	২
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৫০	৩	০.৪০	৮	০.৫০	৪	০.৫৯	৬
মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ								
পশ্চিমবঙ্গ	০.৩৫	১৭	০.২৯	১৭	০.১৪	১৮	০.৬২	৫
রাজস্থান	০.৪৬	৭	০.২৯	১৬	০.৫৫	৩	০.৫৪	১২
মধ্যপ্রদেশ	০.৪৭	৬	০.৪০	৯	০.৬২	১	০.৩৮	২০
ছত্তিশগড়	০.৪৪	৮	০.৩৯	১০	০.৪৭	৫	০.৪৭	১৮
কেরল	০.৪২	১০	০.৪২	৭	০.৩১	১৩	০.৫৩	১৩
হিমাচলপ্রদেশ	০.৪৭	৫	০.৪৬	৩	০.৩৩	১২	০.৬২	৪
পঞ্জাব	০.৪০	১৩	০.১৯	২০	০.৪৩	৬	০.৫৮	৯
নিম্ন অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যসমূহ								
ওড়িশা	০.৩৬	১৫	০.৩৩	১২	০.২৬	১৪	০.৫০	১৫
উত্তরপ্রদেশ	০.৩৬	১৬	০.৩২	১৩	০.৩৭	১০	০.৩৮	১৯
আসাম	০.৩২	১৯	০.২৬	১৮	০.১৩	১৯	০.৫৮	৮
বিহার	০.৩১	২০	০.৩০	১৫	০.১২	২০	০.৫২	১৪
ঝাড়খণ্ড	০.৩৩	১৮	০.২০	১৯	০.২০	১৬	০.৫৯	৭
উত্তরাখণ্ড	০.৩৯	১৪	০.৪৬	৪	০.২৪	১৫	০.৪৮	১৭

সূত্র : ভারতের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পর্যানুক্রমিক স্থান নির্দেশ, ২০১৩।

আসাম, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের সাক্ষরতার হার জাতীয় গড় হারের চেয়ে কম।

উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলিতে ২৫৯টি বিশ্ববিদ্যালয় (৪০.৩ শতাংশ) ও ১৭০৭৯টি কলেজ (৪৮.৯ শতাংশ) রয়েছে। আর এই রাজ্যগুলিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৪৯৩৯৯৫ (৪৬.৯ শতাংশ)। অন্যদিকে মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলিতে ১৪১টি বিশ্ববিদ্যালয় (২১.১৯ শতাংশ) এবং ৭১৩১টি কলেজ (২০.৪ শতাংশ) রয়েছে। এই রাজ্যগুলিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৪৩৫৯১৫। আবার, কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে এমন রাজ্যগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬৩ (২৫.৩ শতাংশ)। কলেজ রয়েছে ৮০১২ (২২.৯ শতাংশ) এবং উচ্চ শিক্ষায় নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০২৬৫১৮ (৩১.৫ শতাংশ)।

তাই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর জোগান এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

আর্থিক বিকাশ, পরিকাঠামো এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলিতে মাঝারি ও কম অঙ্কের বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলির তুলনায় রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) ও মাথাপিছু রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (পার ক্যাপিটা নেট স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট) হার বেশি। আবার এই রাজ্যগুলিতে রেলপথ, রাস্তার দৈর্ঘ্যের নিরিখে পরিকাঠামোও অপেক্ষাকৃত উন্নত (সারণি-৩)।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও মধ্যপ্রদেশের মতো মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলি আর্থিক বিকাশ ও পরিকাঠামোর নিরিখে উন্নতি করছে। ফলে এই রাজ্যগুলি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানার দৌড়েও এগিয়ে যাচ্ছে। কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী

রাজ্যগুলির মধ্যে গোয়া, উত্তরাঞ্চল এবং অরুণাচলপ্রদেশকে বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যে মাথাপিছু আয় অপেক্ষাকৃত কম। ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বিহার ও ঝাড়খণ্ডে রেলপথ ও সড়কপথের দৈর্ঘ্য বেশি হলেও রাজ্যগুলির আয়তনের নিরিখে তাকে মাঝারিই বলা যেতে পারে।

আর্থিক বিকাশ, পরিকাঠামো এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগমনের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ঠিকই কিন্তু এতে, আঞ্চলিক বৈষম্য আরও বাড়ে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক এবং প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক সম্পদ সৃষ্টি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম-কানুন বা বিধি-নিষেধের সংখ্যা ও মাত্রার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশে কিংবা একই দেশের মধ্যে অবস্থিত রাজ্যগুলিকে পর্যায়ক্রমে স্থান দেয়। সেই মতো, সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকে (সারণি-৪) গুজরাটের স্থান প্রথম। শ্রম ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিধি-নিয়মের নিরিখেও এ রাজ্য প্রথম হলেও সরকারের আয়তনের বিচারে এ রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়। আইনি কাঠামো ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই রাজ্য চতুর্থ স্থানে। এই সূচকের প্রথম এগারোটি স্থানে উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলিই রয়েছে। তামিলনাড়ু রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে, তৃতীয় স্থানে অন্ধ্রপ্রদেশ, নবম স্থানে কর্ণাটক এবং একাদশতম স্থানে রয়েছে মহারাষ্ট্র। এই সূচকে সবচেয়ে বড় চমক মহারাষ্ট্র। একাদশতম স্থানে থাকলেও এ দেশের মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৩০ শতাংশই পেয়েছে এই রাজ্য। মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপক রাজ্যগুলির মধ্যে এই সূচকে হিমাচলপ্রদেশের স্থান পঞ্চম, মধ্যপ্রদেশের স্থান ষষ্ঠ। অন্যদিকে, চণ্ডীগড় অষ্টম স্থানে, কেরল দশম, পাঞ্জাব ত্রয়োদশ ও পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ স্থানে। অতএব, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ ক্রমে বাড়ছে। কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপক রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক সন্তোষজনক নয়।

তাই রাজ্যগুলিতে কতটা প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসবে তার ওপর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকের সীমিত প্রভাব রয়েছে।

বিদ্যুতের জোগান ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কতটা টানা যাবে তা কিন্তু পর্যাপ্ত ও গুণমানসম্পন্ন বিদ্যুতের জোগানের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। ভারতের উচ্চ অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলির উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে প্রথম রাজ্য মহারাষ্ট্রের চালু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ২০১২-১৩ সালে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৩.৭ GW যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর পরেই রয়েছে গুজরাট (২২.৭৯ GW), তামিলনাড়ু (১৫.৬০ GW), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৩.৭৯ GW) এবং কর্ণাটক (১২.১৩ GW)। এই রাজ্যগুলিও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপ্তি নিরিখে প্রথম সারিতে পড়ে। মাঝারি অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপক রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্থান (৯.৮৬ GW), পশ্চিমবঙ্গ (৭.৫৭ GW), মধ্যপ্রদেশ (৬.৩২ GW), ছত্তিশগড় (৪.০৩ GW) এবং কেরল (২.৪৯ GW) তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। অন্যদিকে কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ প্রাপক রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তরপ্রদেশ (৯.৩৬ GW) এবং ওড়িশা (৫.৩৩ GW) ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের চালু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ১ GW-এরও কম। তাই রাজ্যের চালু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগমনের এক ওতপ্রোত যোগাযোগ রয়েছে।

পরিশেষে

দেশের মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৭০ শতাংশই ছয়টি রাজ্যে সীমাবদ্ধ যা এ দেশে আঞ্চলিক বৈষম্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আগমনের ওপর জনঘনত্বের প্রভাব নগণ্য। কিন্তু রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর জোগান, আর্থিক বিকাশ, উন্নত পরিকাঠামো, চালু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির উৎপাদন ক্ষমতা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। আবার রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আগমনের ওপর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচকের প্রভাব সীমিত।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের শুধু ছাড় দেওয়ার পরিবর্তে রাজ্য সরকারকে মৌলিক পরিকাঠামো উন্নত করার ওপর বেশি মনোযোগ দিতে হবে। মাঝারি ও কম অঙ্কের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণকারী রাজ্যগুলি যদি প্রশাসনের উন্নতিসাধন, স্বচ্ছতা বিধান, দুর্নীতি দূরীকরণ, মৌলিক পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি আরও গতিশীল হয়ে ওঠে তাহলে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিকাশ প্রক্রিয়াকে আরও জোরদার করবে।❑

[লেখক ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক।

Email : sr_keshava@yahoo.com]

ভারতের বহির্বাণিজ্য

শুধুমাত্র ১৯৯০-এর দশকের অর্থনৈতিক উদারীকরণকে ঘিরেই কি ভারতীয় অর্থনীতির ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব সীমাবদ্ধ? এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনকালে ও স্বাধীনতার পরে ভারতীয় অর্থনীতিতে আমদানি-রপ্তানির সামগ্রিক চিত্রের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে এ দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ইতিবৃত্তটি তুলে ধরেছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

বিশ্বায়ন কাকে বলে তা নিয়ে ভারী ভারী দীর্ঘ আলোচনা চলতেই পারে। তবে সহজ কথায় বিশ্বায়ন মানে অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। এই সম্পর্ক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সব ধরনেরই হতে পারে। বিশ্বায়নের তাই নানান প্রকারভেদ।

অর্থনীতির সূত্রে এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের সংযোগ ঘটে দুটি রাস্তায়—বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে। একটি দেশ যখন ধীরে ধীরে অনুন্নতি থেকে উন্নতির দিকে হাঁটতে থাকে তখন এই সম্পর্কের ধরনধারণগুলি যেমন পালটে যেতে থাকে তেমনই এই সব সম্পর্কের পরিবর্তন একটি দেশের আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়ার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। কোনও দেশের আর্থনীতিক বিকাশের ইতিহাসটি অনুধাবন করতে তাই তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কের ইতিহাসটিও জেনে রাখা দরকার। আর এই সব ইতিহাস জানার দরকার আগামী দিনে দেশটি কোনদিকে এগিয়ে যেতে চলেছে তার একটা আঁচ পাবার জন্যও।

ভারতের বাণিজ্যের ইতিহাসটি সুপ্রাচীন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই দীর্ঘ দিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের একটা জোরদার অবস্থান ছিল এবং সেটা মূলত রপ্তানিমুখী। ভারত সেই সময় যা রপ্তানি করত সেগুলি মূলত দুর্মূল্য সামগ্রী। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের মিশরীয় মমির গায়ে মসলিনের চাদর জড়িয়ে রাখার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ঘটনা যদি প্রমাণ করে ভারতীয় বাণিজ্যের প্রাচীনত্বকে, তাহলে বাণিজ্যের রপ্তানিমুখী প্রবণতাকে প্রমাণ করে বাণিজ্যের ফলে নিট উপার্জন হিসেবে সোনা ও রুপার আমদানিকে।

বস্তুত ভারতের লেনদেন ব্যালান্সের (কোনও দেশের এক বছরের রপ্তানি মূল্য থেকে আমদানি মূল্যকে বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় লেনদেন ব্যালান্স) ইতিহাসটি ঘাটলে দেখা যাবে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এই ব্যালান্সটি ছিল উদ্বৃত্তের ঘরে, স্বাধীনতার পর থেকে যা স্থায়ীভাবে ঘাটতির ঘরে ঢুকে পড়েছে। এই প্রবন্ধে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ধরনধারণ কীভাবে বিভিন্ন সময় পর্বে পালটে পালটে গেছে, কীভাবে পালটেছে তার আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের প্রকৃতি, কীভাবে পালটেছে তার বাণিজ্যসঙ্গী। তবে সে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনে নেব লেনদেন উদ্বৃত্তের দেশ থেকে কীভাবে দেশটি লেনদেন ঘাটতির দেশে পরিণত হল। আমাদের আলোচনার তাই দুটি পর্ব—একটি স্বাধীনতার আগে, অন্যটি স্বাধীনতার পরে। স্বাধীনতার আগের পর্বের আলোচনা আবার সীমাবদ্ধ রাখব ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে, কারণ ব্রিটিশ ভারতেই প্রথম ভারতের একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক চেহারা তৈরি হয়।

স্বাধীনতার আগে

এ দেশে ব্রিটিশ আধিপত্যের একেবারে গোড়ার পর্বে ভারত মূলত দুটি জিনিস রপ্তানি করত। মশলা এবং সুতিবস্ত্র। রপ্তানিটা মূলত হত ইউরোপীয় দেশগুলিতে। ততদিনে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাগামটা অনেকটাই চলে গেছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ভারতীয় পণ্যসম্ভার ব্রিটেনে ঢুকলেও ব্রিটেন ভারতে প্রায় কিছুই রপ্তানি করতে পারছিল না। ব্রিটেনের প্রধান শিল্পপণ্য বলতে তখন পশমবস্ত্র, যার বিশেষ কোনও চাহিদা গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে ছিল না। ফলে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের তীব্র বিরোধিতায় ব্রিটেন ভারতীয় পণ্যের উপর চড়া হারে শুল্ক আরোপ করলে ভারতের রপ্তানি বাধা পেতে শুরু করে।

তবে অবস্থাটা সম্পূর্ণ উলটে যেতে শুরু করে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের পর থেকে। ভারতের বস্ত্র রপ্তানি শুধু বন্ধই প্রায় হয়ে যায় না, উলটে ব্রিটিশ সুতিবস্ত্র ধীরে ধীরে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে থাবা বসাতে শুরু করে। রপ্তানি প্রায় বন্ধ, দেশের বাজারেও ভাগ বসাতে শুরু করেছে বিদেশিরা, এই অবস্থায় উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়ে পড়ে দেশীয় বস্ত্র-উৎপাদকেরা। ফলে উদ্বৃত্ত হয়ে পড়তে শুরু করে কাঁচামালের জোগান। ব্রিটেনের সুতিবস্ত্র শিল্পও তখন কাঁচামালের ব্যাপারে আমেরিকার উপর নির্ভরতা কমাতে চাইছিল। ফল হিসেবে ভারত ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী হয়ে পড়তে শুরু করে। উৎপাদিত পণ্যের পরিবর্তে ভারতের রপ্তানি তালিকায় জায়গা করে নেয় তুলো, পাট, তৈলবীজ, খাদ্যশস্য, পশুর চামড়া প্রভৃতি। এসব পরিবর্তনই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কথা।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। বাণিজ্যের পণ্যসম্ভারগুলি যেমন পালটে যায় তেমনই বেড়ে যায়

বাণিজ্যের পরিমাণও। এর পিছনে অন্যতম প্রধান যে দুটি কারণ তার প্রথমটি হল সেই সময় নাগাদ সারা ভারত জুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পূর্ণ হওয়া এবং দ্বিতীয়টি ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল মারফত বাণিজ্যের সূত্রপাত ঘটা। তখনও পর্যন্ত ভারতের প্রধান বাণিজ্যসঙ্গী দেশ বলতে ছিল ইউরোপীয় দেশগুলি। ফলে সুয়েজ খাল দিয়ে বাণিজ্যের সূত্রপাত হওয়ায় বাণিজ্যের খরচ ও সময় অনেকটাই কমে যায়, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব গিয়ে পড়ে বাণিজ্যের পরিমাণের উপর। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশদের ভারত-বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার প্রভাবও বাণিজ্যের উপর পড়ে। ভারতে রেলপথ স্থাপন, বন্দর নির্মাণ, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিকেও সড়ক ও রেলপথের মাধ্যমে বন্দরগুলির সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার কাজগুলি সরকার নির্বিঘ্নে করতে পেরেছিল সারা ভারতের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পাবার কারণেই এবং এই কাজ সরকার করেছিল বাণিজ্যকে বাড়ানোর দিকে নজর রেখেই। এছাড়া ১৮৭৪ সালের মধ্যে সমস্ত ধরনের রপ্তানি শুল্ক এবং ১৮৮২ সাল নাগাদ সমস্ত ধরনের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বাণিজ্যের উপর তার একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়লেও ভারত কিন্তু ক্রমশ আরও বেশি করে কাঁচামাল রপ্তানির দিকেই ঝুঁকে পড়ছিল। ওই সময় নাগাদ জার্মানি ও জাপান শিল্পে প্রভূত উন্নতি করলে তারাও তাদের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্র হিসেবে ভারতকে বেছে নেয়। এমনকী বাণিজ্যের প্রয়োজনে তারা ভারতে তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা পর্যন্ত খুলে ফেলে, ভারত মহাসাগরে চালু করে নিজেদের জাহাজ পরিবহণ ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে ভারত যে শেষ পর্যন্ত লেনদেন ঘাটতির দেশে পরিণত হয়েছে তার বীজ অতএব এই সময় থেকেই প্রোথিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ওঠা-পড়া হয়েছে, কিন্তু দুটি বছর (১৯২০-২১ ও ১৯২১-২২) বাদে বাণিজ্য ব্যালান্সে যেমন কখনও ঘাটতি দেখা যায়নি, তেমনই ভারতও আর কখনও কাঁচামাল রপ্তানিকারকের তকমা ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অন্তত তিনবার বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়েছিল। দু-বার দুটি বিশ্বযুদ্ধের জন্য, একবার তিরিশের দশকের বিশ্বমন্দার কারণে।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ই, অন্যান্য আর সব দেশের মতো, ভারতের মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমেছিল। তবে দুটি ক্ষেত্রেই রপ্তানির চেয়ে আমদানি কমেছিল বেশি পরিমাণে। আমদানির পরিমাণ বেশি হারে কমার কারণ ভারতের প্রধান বাণিজ্যসঙ্গী যে সমস্ত দেশ, ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ, তারা সব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের পরিবর্তে তারা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে মনোনিবেশ করেছিল।

১৯২৯ সাল থেকে যে বিশ্বব্যাপী মন্দার সূত্রপাত হয় তার হাত থেকে রেহাই পায়নি ভারতীয় বাণিজ্যও। আমদানি, রপ্তানি দুটিই কমেছিল। রপ্তানি কমার অন্যতম প্রধান কারণ মন্দার কবলে পড়ে শিল্পোন্নত দেশগুলি তাদের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছিল। ফল হিসেবে কমেছিল কাঁচামালের চাহিদাও। আবার একই কারণে কমেছিল আমদানিও। রপ্তানি থেকে আয় কমে যাওয়ায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমেছিল, যার ফল গিয়ে পড়েছিল আমদানি-পণ্যের চাহিদার উপর। অবশ্য আমদানি-রপ্তানি কমার অন্যবিধ কারণও ছিল। যেমন যে সমস্ত শিল্পপণ্য ভারত আমদানি করত, ১৯২৪-৩২ সালের মধ্যে ওই সমস্ত শিল্পকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসার ফলে দেশীয় দ্রব্যের জোগান বেড়েছিল, কমেছিল বিদেশি পণ্যের চাহিদা। তবে বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যেমন, মন্দার সময়েও তেমনি রপ্তানির চেয়ে আমদানি কমেছিল বেশি হারে, যার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি কখনওই তৈরি হয়নি।

বাণিজ্য ঘাটতি ধারাবাহিকভাবে তৈরি হতে শুরু করল স্বাধীনতার পর থেকে। এই ঘাটতির পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ দুটি। একটি ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ভারত চূড়ান্ত দ্রব্যের পরিবর্তে পাকাপাকিভাবে কাঁচামালের রপ্তানিকারক হয়ে উঠেছিল। কাঁচামালের রপ্তানিকারক হলে হয় কী, বিশ্ব বাজারে দরকষাকষির ক্ষমতাটি অনেকটাই কমে যায়। কমে যায় কারণ কাঁচামালগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিপণ্যসমূহ, যেগুলি কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ দিন সংরক্ষণের পক্ষে অনুপযুক্ত। আর দরকষাকষির ক্ষমতা কমে গেলে বাজারের দামস্তর বিপক্ষে চলে যায়। ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সের ধারাবাহিক ঘাটতির কারণটি অতএব অনেকটাই তার রপ্তানি পণ্যসম্ভারের চরিত্র বদলের কারণে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের ধারাবাহিক বাণিজ্য ঘাটতির দ্বিতীয় কারণটি নিহিত ছিল দেশভাগের বেদনাদায়ক ঘটনাটির মধ্যে। দেশভাগের ফলে কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী একটা বড় অংশ চলে গেল পাকিস্তানের মধ্যে। এতে ক্ষতিটা দুভাবে হল। এক তো রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সম্ভার বহুল পরিমাণে কমে গেল। দ্বিতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে যেটুকু শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল তার কাঁচামালের জোগানে টান পড়ায় আমদানি-নির্ভরতা বাড়তে শুরু করল। আর এই ক্ষতির নিট ফল হল আমদানি বৃদ্ধি ও রপ্তানি হ্রাস, যার চূড়ান্ত পরিণতি বাণিজ্য ব্যালান্সের নিরবচ্ছিন্ন ঘাটতি।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতার পর থেকে কেটে গেছে সাতষট্টি বছর। এই দীর্ঘ সময়ে বাণিজ্য ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত হয়েছে মাত্র দু-বার। ১৯৭২-৭৩ সালে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১৩.৪০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে ৭.৭ কোটি টাকা। বাকি পঁয়ষট্টি বছরে বাণিজ্য ব্যালান্স শুধু যে ঘাটতির ঘরেই আটকে থেকেছে তাই-ই নয়, তার পরিমাণ ক্রমশ বেড়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমদানি-রপ্তানি দুই-ই বেড়েছে, তবে রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি হারে বেড়েছে।

তবে স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারেই আলাদা। বাণিজ্যসঙ্গী আলাদা, বাণিজ্যের বিষয়গুলিও আলাদা। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ভারত বাণিজ্য করত মূলত ব্রিটেন এবং ব্রিটেনের উপনিবেশগুলির সঙ্গে। বাণিজ্যসঙ্গীর এই নির্বাচনে অর্থনীতির যুক্তি

যত না ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল ঔপনিবেশিক শাসকের ইচ্ছে-অনিচ্ছে। এই একই ইচ্ছে-অনিচ্ছে জড়িয়েছিল বাণিজ্যের বিষয় নির্বাচনেও। উপনিবেশিক শাসকের প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারেই ভারত শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানি করত। স্বাধীনতার পর, বলা বাহুল্য, এই বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বাণিজ্যসঙ্গীর যেমন পরিবর্তন ঘটেছে বারবার তেমনই বাণিজ্যের পণ্যসম্ভারের পরিবর্তন ঘটেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই পরিবর্তন ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশেরই ইঙ্গিত দিয়েছে।

স্বাধীনতার কিছুকাল পরেও ভারতের বাণিজ্যের সিংহভাগই চলত ব্রিটেন ও তার উপনিবেশগুলির সঙ্গে। এর প্রধান কারণ, স্বাধীনতার পর ভারত তখনও পর্যন্ত অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ পায়নি। পরবর্তীকালে অবশ্য ভারতের বাণিজ্যসঙ্গীর সংখ্যা যেমন বেড়েছে, বৈচিত্রও তেমনই বেড়েছে। ভারত যে সমস্ত দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে, আলোচনার সুবিধার্থে সেগুলিকে সাধারণভাবে পাঁচটি দলে ভাগ করা হয়। এগুলি হল—ওইসিডি দেশসমূহ, ওপেক দেশসমূহ, পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ, বিকাশশীল দেশসমূহ এবং অন্যান্য দেশসমূহ। ওইসিডি দেশসমূহের মধ্যে আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও সুইজারল্যান্ড। স্বাধীনতার পর এদের সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মোট বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি। ধীরে ধীরে সেই পরিমাণ কমেছে। এই কমার পেছনে সব সময় যে আর্থনীতিক কারণগুলিই কাজ করেছে তাও নয়, বাস্তবে তা করেও না। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পর্কগুলিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেমন বাণিজ্যিক সম্পর্ক অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায় ভারত-বাংলাদেশ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। ওইসিডি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ যেমন ধীরে ধীরে কমেছে তেমনি বেড়েছে বিকাশশীল দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য। ওইসিডি দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত রপ্তানি করত কাঁচামাল,

সারণি-১
ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স (স্বাধীনতা-পূর্ব)

(কোটি টাকায়)

সময়-পর্ব	রপ্তানি (বাৎসরিক গড়)	আমদানি (বাৎসরিক গড়)	ব্যালান্স (বাৎসরিক গড়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৮৬৪-৬৯	৫৫.৮৬	৩১.৭০	২৪.১৬
১৮৭৪-৭৯	৬০.৩২	৩৮.৩৬	২১.৯৬
১৮৭৯-৮৪	৭৯.০৮	৫০.১৬	২৮.৯২
১৮৮৪-৮৯	৮৮.৬৪	৬১.৫১	২৭.১৩
১৮৮৯-৯৪	১০৪.৯৯	৭০.৭৮	৩৪.২১
১৮৯৪-৯৯	১০৭.৫৩	৭৩.৬৭	৩৩.৮৬
১৮৯৯-১৯০৪	১২৪.৯২	৮৪.৬৮	৪০.২৪
১৯০৪-০৯	১৬৫.৪৪	১১৯.৮৫	৪৫.৫৯
১৯০৯-১৪	২২৪.২৩	১৫১.৬৭	৭২.৫৬
১৯১৪-১৫	১৯৫	১৩৭	৫৮
১৯১৫-১৬	১৮৫	১০৫	৮০
১৯১৬-১৭	২০২	৮৮	১১৪
১৯১৭-১৮	১৮৭	৭১	১১৬
১৯১৮-১৯	১৬০	৬৩	৯৭
১৯১৯-২০	৩৩৬	২২১.৭০	১১৪.৩০
১৯২০-২১	২৬৭.৭৬	৩৪৭.৫৬	(–) ৭৯.৮০
১৯২১-২২	২৪৮.৬৫	২৮২.৫৯	(–) ৩৩.৯৪
১৯২২-২৩	৩১৬.০৭	২৪৬.১৯	৬৯.৮৮
১৯২৩-২৪	৩৬৩.৩৭	২৩৭.১৮	১২৬.১৯
১৯২৪-২৫	৪০০.২৭	২৫৩.৩৭	১৪৬.৮৭
১৯২৫-২৬	৩৮৬.৮২	২৩৬.০০	১৫০.৮২
১৯২৬-২৭	৩১১.০৫	২৪০.৮২	৭০.২৩
১৯২৭-২৮	৩৩০.২৬	২৬১.৫৩	৬৮.৭৩
১৯২৮-২৯	৩৩৯.১৫	২৬৩.৪০	৭৫.৭৫
১৯২৯-৩০	৩১৮.৯৯	২৪৯.৭১	৬৯.২৮
১৯৩০-৩১	২২৬.৫০	১৭৩.০৬	৫৩.৪৪
১৯৩১-৩২	১৬১.২০	১৩০.৬৪	৩০.৫৬
১৯৩২-৩৩	১৩৬.০৭	১৩৫.০১	০১.০৬
১৯৩৩-৩৪	১৫০.২৩	১১৭.২৮	৩২.৯৫
১৯৩৪-৩৫	১৫৫.৫০	১৩৪.৫৯	২০.৯১
১৯৩৫-৩৬	১৬৪.৬০	১৩৬.৭৭	২৭.৮৩
১৯৩৬-৩৭	২০২.৪৯	১২৭.৭২	৭৪.৭৭
১৯৩৭-৩৮	১৮৯.৭৭	১৭৭.২২	১২.৫৫
১৯৩৮-৩৯	১৬৯.৯৭	১৫৫.৫১	১৪.৪৬
১৯৩৯-৪০	২১৩.৫৭	১৬৪.৭৬	৪৮.৮১
১৯৪০-৪১	১৯৮.৬৯	১৫৬.৭২	৪১.৯৭
১৯৪১-৪২	২৫২.৮৮	১৭২.৮৬	৮০.০২
১৯৪২-৪৩	১৯৪.৭০	১১০.৩৯	৮৪.৩১
১৯৪৩-৪৪	২০৯.৯৯	১১৯.০৫	৯০.৯৪
১৯৪৪-৪৫	২২৭.০৭	২০০.৯৯	২৬.০৮
১৯৪৫-৪৬	২৬৫.৫৩	২৪৪.৮৫	২০.৬৮
১৯৪৬-৪৭	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত

আমদানি করত সম্পূর্ণ উৎপাদিত পণ্য। বিকাশশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটাই বিপরীত, যা প্রমাণ করে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেই। ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ উনিশশো আশির দশক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে শুরু করে ওপেক দেশগুলির সঙ্গে। তেল সংকটকে কেন্দ্র করে ওপেক দেশগুলি উনিশশো সত্তরের দশকে দু-দফায় অনেকটা বাড়িয়ে দেবার ফলে সূত্রপাত হয় তেল আমদানি বাবদ খরচের বৃদ্ধি। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম তারপর আর কখনওই খুব একটা কমেনি, ফলে কমেনি এই খাতে আমদানির খরচ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তেলের চাহিদার বৃদ্ধি, যার ফলে এই খাতে খরচ আরও বেড়েছে। ওপেক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিও তাই প্রকারান্তরে ভারতের আর্থনীতিক অগ্রগতিকেই নির্দেশ করে, কারণ তেলকেই আধুনিক সভ্যতার দ্যোতক বলে মনে করা হয়। সেই তেলের ব্যবহার বাড়ার অর্থ তো তাই ভারত সভ্য হচ্ছে, আধুনিক হচ্ছে।

বাণিজ্যসঙ্গী বদলের বিষয়টি ছেড়ে যদি বাণিজ্যের পণ্যসম্ভার পরিবর্তনের দিকে তাকাই তাহলেও আর্থনীতিক অগ্রগতির ছবিটি পরিষ্কার হবে। স্বাধীনতার সময়ে ভারতের রপ্তানির তালিকায় ছিল খাদ্যশস্য ও কৃষিজ কাঁচামাল। রপ্তানি পণ্য হিসেবে এদের গুরুত্ব ক্রমশ কমেছে। কমার পিছনে একটা কারণ যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের মধ্যে এই সব পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, অন্য কারণ তেমনি দেশের মধ্যেই শিল্পের বিকাশের কারণেও এই সব পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। কৃষিজ কাঁচামালের একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। ১৯৬০-৬১ সালেও ভারতের রপ্তানি আয়ের ২১ শতাংশ আসত পাট রপ্তানি থেকে। ২০১১-১২ সালে ভারতের মোট রপ্তানি আয়ে পাটের অবদান মাত্র ০.১ শতাংশ। ১৯৬০-৬১ সালে আরেকটি প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল চা। মোট রপ্তানি আয়ের ১৯ শতাংশ আসত চা রপ্তানি থেকে। ২০১১-১২ সালে মোট রপ্তানি আয়ে চায়ের অবদান এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ০.৩ শতাংশে। কৃষিপণ্যের রপ্তানি কমে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বেড়েছে শিল্পজাত

সারণি-২
ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স (স্বাধীনতা-উত্তর)

(কোটি টাকায়)

সময়-পর্ব	রপ্তানি (বাৎসরিক গড়)	আমদানি (বাৎসরিক গড়)	ব্যালান্স (বাৎসরিক গড়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৪৭-৪৮	৪০৩	৩৯০	১৩
১৯৪৮-৪৯	৪৫৯	৬৪৪	–১৮৫
১৯৪৯-৫০	৪৮৫	৬১৭	–১৩২
১৯৫০-৫১	৬০৬	৬০৮	–২
১৯৫১-৫২	৭১৬	৮৯০	–১৭৪
১৯৫২-৫৩	৫৭৮	৭০২	–১২৪
১৯৫৩-৫৪	৫৩১	৬১০	–৭৯
১৯৫৪-৫৫	৫৯৩	৭০০	–১০৭
১৯৫৫-৫৬	৬০৯	৭৭৪	–১৬৫
১৯৫৬-৫৭	৬০৫	৮৪১	–২৩৬
১৯৫৭-৫৮	৫৬১	১০৩৫	–৪৭৪
১৯৫৮-৫৯	৫৮১	৯০৬	–৩২৫
১৯৫৯-৬০	৬৪০	৯৬১	–৩২১
১৯৬০-৬১	৬৪২	১১২২	–৪৮০
১৯৬১-৬২	৬৬০	১০৯০	–৪৩০
১৯৬২-৬৩	৬৮৫	১১৩১	–৪৪৬
১৯৬৩-৬৪	৭৯৩	১২২৩	–৪৩০
১৯৬৪-৬৫	৮১৬	১৩৪৯	–৫৩৩
১৯৬৫-৬৬	৮১০	১৪০৯	–৫৯৯
১৯৬৬-৬৭	১১৫৭	২০৭৮	–৯২১
১৯৬৭-৬৮	১১৯৯	২০০৮	–৮০৯
১৯৬৮-৬৯	১৩৫৮	১৯০৯	–৫৫১
১৯৬৯-৭০	১৪১৩	১৫৮২	–১৬৯
১৯৭০-৭১	১৫৩৫	১৬৩৪	–৯৯
১৯৭১-৭২	১৬০৮	১৮২৫	–২১৭
১৯৭২-৭৩	১৯৭১	১৮৬৭	১০৪
১৯৭৩-৭৪	২৫২৩	২৯৫৫	–৪৩২
১৯৭৪-৭৫	৩৩২৯	৪৫১৯	–১১৯০
১৯৭৫-৭৬	৪০৩৬	৫২৬৫	–১২২৯
১৯৭৬-৭৭	৫১৪২	৫০৭৪	৬৮
১৯৭৭-৭৮	৫৪০৮	৬০২০	–৬১২
১৯৭৮-৭৯	৫৭২৬	৬৮১১	–১০৮৫
১৯৭৯-৮০	৬৪১৮	৯১৪৩	–২৭২৫
১৯৮০-৮১	৬৭১১	১২৫৪৯	–৫৮৩৮
১৯৮১-৮২	৭৮০৬	১৩৬০৮	–৫৮০২
১৯৮২-৮৩	৮৮০৩	১৪২৯৩	–৫৪৯০
১৯৮৩-৮৪	৯৭৭১	১৫৮৩১	–৬০৬০

(বাকি অংশ পরের পাতায়)

পণ্যের রপ্তানি। এই সব পণ্যের তালিকায় প্রথমেই আছে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে আছে রত্ন ও অলংকার, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক, রেডিমেড বস্ত্রাদি, চর্মজাত দ্রব্য ইত্যাদি।

রপ্তানি পণ্য ছেড়ে যদি আমদানি পণ্যের দিকে তাকাই সেখানেও ভারতীয় অর্থনীতির শিল্পোন্নতির প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আমদানি পণ্যের তালিকায় পরিকল্পনা শুরুর দিকে অন্যতম প্রধান জায়গা করে নিয়েছিল মূলধনি দ্রব্য। এর কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকেই ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নিজস্ব শিল্পভিত্তি গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিল ভারত। ১৯৬০-৬১ সালে মোট আমদানির ৩১.৭ শতাংশ ছিল মূলধনি দ্রব্য। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমদানি দ্রব্য হিসেবে মূলধনি দ্রব্যের গুরুত্ব কমে এসেছে, যার অর্থ ভারত একটি শিল্পভিত্তি ইতিমধ্যেই গড়ে তুলেছে। ২০১১-১২ সালে মোট আমদানির মাত্র ১৩.২ শতাংশ ছিল মূলধনি দ্রব্য। উনিশশো ষাটের দশক থেকে আবার রাসায়নিক সারের আমদানি বাড়তে শুরু করে, যে বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল নব্বইয়ের দশক অবধি। সারের আমদানি বাড়তে শুরু করার কারণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রবর্তন। সাম্প্রতিককালে আমদানি দ্রব্যের তালিকায় অন্যতম প্রধান স্থানটি দখল করে নিচ্ছে মুক্তো ও বিভিন্ন ধরনের পাথর। ভারতে এগুলি আমদানি করে তার সাহায্যে অলংকার তৈরি হচ্ছে, যা কিনা ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের তালিকায় অন্যতম প্রধান নাম। সব মিলিয়ে ভারতের আমদানি পণ্যের তালিকার দিকে নজর রাখলেও ভারতের শিল্পোন্নয়নভিত্তিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটলেও ভারত যে এখনও বিকাশশীল দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলে উন্নত দেশের কক্ষপথে ঢুকতে পারেনি তা বোঝা যায় তার বাণিজ্য ব্যালান্সের অঙ্কের দিকে তাকালেই। ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে, বেড়েছে আমদানি-রপ্তানি দুটিই, দুটি ক্ষেত্রের পরিবর্তনই সাক্ষ্য দিচ্ছে অর্থনৈতিক বিকাশের, কিন্তু বাণিজ্য ঘাটতি কমা দূরে থাক, বেড়েই চলেছে। উন্নত দেশের তকমা অর্জন করতে গেলে তাই ভারতকে আগে স্বনির্ভর হতে হবে, তারপর রপ্তানি বাড়িয়ে বিশ্ববাজারেই প্রমাণ করতে হবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। প্রমাণ যেদিন হবে সেদিন ভারত আবার বাণিজ্য উদ্বৃত্তের দেশে রূপান্তরিত হবে, যেমনটি সে আগে ছিল।❑

[লেখক আরামবাগ কলেজে অর্থনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক।]

সারণি-২
ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স (স্বাধীনতা-উত্তর)

(কোটি টাকায়)

সময়-পর্ব	রপ্তানি (বাৎসরিক) গড়	আমদানি (বাৎসরিক) গড়	ব্যালান্স (বাৎসরিক) গড়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৮৪-৮৫	১১৭৪৪	১৭১৩৪	–৫৩৯০
১৯৮৫-৮৬	১০৮৯৫	১৯৬৫৮	–৮৭৬৩
১৯৮৬-৮৭	১২৪৫২	২০০৯৬	–৭৬৪৪
১৯৮৭-৮৮	১৫৬৭৪	২২২৪৪	–৬৫৭০
১৯৮৮-৮৯	২০২৩২	২৮২৩৫	–৮০০৩
১৯৮৯-৯০	২৭৬৫৮	৩৫৩২৮	–৭৬৭০
১৯৯০-৯১	৩২৫৫৩	৪৩১৯৮	–১০৬৪৫
১৯৯১-৯২	৪৪০৪১	৪৭৮৫১	–৩৮১০
১৯৯২-৯৩	৫৩৬৮৮	৬৩৩৭৫	–৯৬৮৭
১৯৯৩-৯৪	৬৯৭৫১	৭৩১০১	–৩৩৫০
১৯৯৪-৯৫	৮২৬৭৪	৮৯৯৭১	–৭২৯৭
১৯৯৫-৯৬	১০৬৩৫৩	১২২৬৭৮	–১৬৩২৫
১৯৯৬-৯৭	১১৮৮১৭	১৩৮৯২০	–২০১০৩
১৯৯৭-৯৮	১৩০১০০	১৫৪১৭৬	–২৪০৭৬
১৯৯৮-৯৯	১৩৯৭৫২	১৭৮৩৩২	–৩৮৫৮০
১৯৯৯-২০০০	১৫৯৫৬১	২১৫২৩৬	–৫৫৬৭৫
২০০০-০১	২০৩৫৭১	২৩০৮৭৩	–২৭৩০২
২০০১-০২	২০৯০১৮	২৪৫২০০	–৩৬১৮২
২০০২-০৩	২৫৫১৩৭	২৯৭২০৬	–৪২০৬৯
২০০৩-০৪	২৯৩৩৬৭	৩৫৯১০৮	–৬৫৭৪১
২০০৪-০৫	৩৭৫৩৪০	৫০১০৬৫	–১২৫৭২৫
২০০৫-০৬	৪৫৬৪১৮	৬৬০৪০৯	–২০৩৯৯১
২০০৬-০৭	৫৭১৭৭৯	৮৪০৫০৬	–২৬৮৭২৭
২০০৭-০৮	৬৫৫৮৬৪	১০১২৩১২	–৩৫৬৪৪৮
২০০৮-০৯	৮৪০৭৫৫	১৩৭৪৪৩৬	–৫৩৩৬৮০
২০০৯-১০	৮৪৫৫৩৪	১৩৬৩৭৩৬	–৫১৮২০২
২০১০-১১	১১৪২৯২২	১৬৮৩৪৬৭	–৫৪০৫৪৫
২০১১-১২	১৪৬৫৯৫৯	২৩৪৫৪৬৩	–৮৭৯৫০৪

(আগের পাতা থেকে)

WBCS-2013 Gr. A/B INTERVIEW

ডব্লুবিসিএস যেন সাপ-লুডোর খেলা। ইন্টারভিউ হল ৯৯ ঘরের সেই বড় সাপটি। এটিকে অতিক্রম করতে না পারলে আবার শূন্য থেকে শুরু—তিল তিল করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সলিল সমাধি।

ইন্টারভিউ জ্ঞান পরীক্ষার জায়গা নয়, তুমি তোমার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছ প্রিলি এবং মেনস পরীক্ষায়। এটি আসলে টেস্ট অব পার্সোনালিটি। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব যাচাইয়ের পরীক্ষা। এর প্রস্তুতি সে অর্থে ধরাবাঁধা সময়ের মধ্যে হতে পারে না। এটি একটি পদ্ধতি (প্রসেস) যার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আপনিই রপ্ত হয়ে যায়। চরিত্রে বসে যায়। তোমার ঘরে প্রবেশ, বেরিয়ে যাওয়া, তোমার বসা, কথা বলার ধরন, প্রতিক্রিয়া প্রকাশের প্রক্রিয়া—এসবই তোমার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশ ঘটায় পরিবেশ। যাদের পারিবারিক এবং সামাজিক পরিবেশ সিভিল সারভেন্টদের পক্ষে অনুকূল তারা রাজত্ব অর্ধেক জয় করে বসে আছে।

হাতে সময় বড় কম, প্রস্তুতি নিন আজ থেকেই

একটু লক্ষ করে দেখো, একজন সিভিল সারভেন্টের ছেলে বা মেয়ে সিভিল সারভেন্ট হয়, তেমনই ডাক্তারের ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার হওয়ার দিকে ঝোঁকে। আসলে পিতামাতা যে পরিবেশের মানুষ, তাদের সন্তানরাও সে পরিবেশে নিজেকে সহজ, সাবলীল বোধ করে। খুব সহজে সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছতে পারে। কিন্তু যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সেই পরিবেশ পায়নি বা যারা শহরের পরিবেশে বেড়ে ওঠেনি তাদের বিসিএস-এ সম্ভাবনা নেই এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। এটা ঠিক, তারা একটু পিছিয়ে শুরু করছে প্রতিযোগিতা। তবে নিজের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে প্রস্তুতি করলে, হার না-মানা মনোভাব, একাগ্রতা, নিষ্ঠা থাকলে হেরে যাওয়ার কোনো কারণ নেই।

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে প্রস্তুতির স্ট্র্যাটেজি কি হবে। তা জানতে হলে সর্বাগ্রে জানা দরকার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কোন কোন গুণ থাকা চাই। এবার দেখতে হবে সেই সব গুণ তোমার চরিত্রে আছে কিনা। একটি দল বা গোষ্ঠীতে কর্মী পাওয়া গেলেও যেতে পারে বেশ কয়েক জন তবে চাইলেই একজন নেতা পাওয়া যায় না। নেতৃত্বদান এক বিরাট গুণ। নেতৃত্বদান বা লিডারশিপ কোয়ালিটি তোমার আছে কি?

একজন অফিসারের আরও একটি বড় গুণ নিজের মত এবং সিদ্ধান্ত ঊর্ধ্বতন, অধস্তন এবং সম-পদাধিকারীর মধ্যে কমিউনিকেট করতে পারা। তুমি কি তা পারো? তার জন্য দরকার নিজের মত ও সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা।

এখন লাখ টাকার প্রশ্ন হল, সামান্য সময়ের এই পার্সোনালিটি টেস্টে কী করে বোঝা যাবে তোমার চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলির সমাবেশ ঘটেছে কিনা? এর দুটি পথ আছে। এক, তোমাকে সুকৌশলে তোমার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করতে হবে। আর দুই, তোমার টুকরো-টুকরো কথা, হাত-পা নাড়া, কথোপকথনের সময় তোমার চোখ-মুখের ভঙ্গিই তোমার অজান্তে প্রকাশ করে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি। যদি তোমার চারিত্রিক গুণাবলীতে কোনো খামতি থেকেও থাকে বড় অভিনেতার মতো নিপুণ অভিনয়ে সেই সব খামতি ঢাকতে হবে। সেই সব দেখে, অনুধাবন করে ইন্টারভিউয়াররা তোমার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তাবড় তাবড় অভিনেতারাও রিহার্সাল ছাড়া স্টেজ পারফরমেন্সের কথা ভাবতেও পারেন না। তাই ইন্টারভিউ প্রার্থীদেরও উচিত বারবার রিহার্সাল দিয়ে প্রকৃত ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে বেস্ট পারফরমেন্স তুলে ধরা। ইন্টারভিউ গ্রুমিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে অদ্বিতীয় তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ডব্লুবিসিএস টপার এবং কর্পোরেট গুরুদের গ্রুমিং সেশন এবং তাদের সামনে বারবার মক ইন্টারভিউ তোমার ভুলত্রুটিকে একদিকে যেমন ধরিয়ে দেবে, অপর দিকে তেমন মনের মধ্যে সঞ্চার করবে আত্মবিশ্বাস। ওভার নাইট প্রস্তুতিতে পারফরমেন্সের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। আর দেরি না করে আজই যোগাযোগ করো, নিশ্চিত করো গ্রুপ-'এ'/'বি'-তে সাফল্য।

প্রিলিম-২০১৫ মক টেস্ট

আপনি কি ডব্লুবিসিএস-২০১৫ প্রিলি পরীক্ষায় বসছেন? আপনার প্রস্তুতি সঠিক পথে চলছে কিনা তা জেনে নেওয়া একান্তই জরুরি। বারংবার মক টেস্ট দিয়ে নিজের ভুলগুলো শুধরে নিন, আর নিজের নেট স্কোরকে রাখুন কাট অফের ওপরে। একমাত্র আমাদেরই সুপরিকল্পিত এবং স্ট্যান্ডার্ড মক টেস্টগুলি পারে এ বছর আপনার প্রিলির বাধাকে অতিক্রম করাতে। মক টেস্ট প্যাকেজে থাকছে—

- ☑ ১০-১২টি ২০০ নম্বরের হুবহু প্রিলির অনুরূপ মক টেস্ট।
- ☑ প্রতিটি মকটেস্টের পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল।
- ☑ সাফল্যের টিপস সংক্রান্ত স্পেশাল ক্লাশ।
- ☑ নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণ, আপশন নির্ণয়ের ওপর স্পেশাল ক্লাশ।
- ☑ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সম্পূর্ণ নোটস।
- ☑ ৬০টিরও বেশি ক্লাশ টেস্ট।

??অপশনাল নিয়ে বিভ্রান্ত??

WBCS গ্রুপ-'A' এবং 'B'-তে সাফল্যের চাবিকাঠি হল অপশনাল। এ হেন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে সব দিক বিবেচনা করে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমেই একমাত্র তা সম্ভব। এমনই এক কাউন্সেলিংয়ে যোগদান করতে OPT লিখে নিজের নাম SMS করুন ৯৬৭৪৪৭৮৬৪৪ নম্বরে।

WBCS-2015 : PRELI + MAINS
Postal Course Also Available

Academic Association
The Self Culture Institute, 53/6, College Street (College Square), Kolkata-700073
9830770440
9674478644
Website: www.academicassociation.in ▪ Centre: Uluberia-9051392240 • Birati-9674555451 • Darjeeling-9832041123

ভারতে খুচরো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

বিপদ নাকি বিকাশের সম্ভাব্য উৎস

বহু-পণ্যের (মাল্টি ব্র্যান্ড) খুচরো ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদন দেওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে, বিভিন্ন সমীক্ষা ও গবেষণাপত্রের নিরিখে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখেছেন **ড. লীনা অজিত কৌশল।** *প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কীভাবে বিকাশ ও উন্নয়নের সম্ভাব্য উৎস হয়ে উঠতে পারে, তারও রূপরেখা রয়েছে এই নিবন্ধে।*

ভারতের খুচরো ক্ষেত্র মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-র ১৪-১৫ শতাংশ অধিকার করে থাকায় এটি দেশি-বিদেশি সংস্থাগুলির কাছে বিনিয়োগের আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। ২০১২ সালে ভারত খুচরো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিয়ম শিথিল করে ১০০ শতাংশ বিদেশি মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে প্রবেশের অধিকার দেয়। তবে তারা যে কোনও একটি ব্র্যান্ডের পণ্যই বিক্রি করতে পারবে এবং উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ৩০ শতাংশ নিতে হবে এদেশ থেকেই। ওই বছরেরই শেষের দিকে বহু-পণ্যের খুচরো ব্যবসাতেও বিদেশি সংস্থাগুলির প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হয়, তবে এক্ষেত্রে বিদেশি মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয় ৫১ শতাংশে। এছাড়া শর্ত অনুযায়ী, বিদেশি সংস্থাগুলিকে এক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ কোটি ডলার লগ্নি করতে হবে। এর অর্ধেক অর্থ ব্যবহার করতে হবে গুদামঘর, হিমঘর নির্মাণের মতো পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে। ২০১৪ সালে নবনির্বাচিত সরকার, উদার অর্থনৈতিক নীতিগত কাঠামো এবং অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিকে সমর্থন জানালেও বহু-পণ্যের খুচরো ব্যবসায় প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি নিষিদ্ধ করে। দেশীয় খুচরো ব্যবসায়ীরা বিদেশি লগ্নিকারকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবেন না, এমন আশঙ্কায় এই পদক্ষেপ। সংক্ষেপে বলতে গেলে, খুচরো ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে বিতর্ক বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে। একদিকে অর্থনীতির বিকাশ ও উন্নয়নে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ভূমিকাকে স্বীকৃতি জানানো হচ্ছে, আবার অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক বিরোধিতার সামনে দেখানো হচ্ছে নমনীয়তা।

ভারতের খুচরো শিল্পক্ষেত্রের সংযুক্ত বার্ষিক বিকাশ হার (সিএজিআর) ২০১০-১২ সালে ছিল ১০.৬ শতাংশ। ২০১৫ সালে এই হার ১৫ শতাংশ ছোঁবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে মোট বাজার ৭৫ থেকে ৮৫ হাজার কোটি ডলারের। ভারতের খুচরো ক্ষেত্র দুটি ভাগে বিভক্ত। সংগঠিত এবং অসংগঠিত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বংশপরম্পরায় পরিচালিত পাড়ার দোকান। আর সংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে সুপারমার্কেট, হাইপারমার্কেট, বহুশাখা বিপণি ও বিপণিশৃঙ্খল। মোট খুচরো বাজারের ৮ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রের দখলে। ২০২০ সালের মধ্যে তা ২০ শতাংশে পৌঁছবার সম্ভাবনা (ডেলোইট, ২০১৩)। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, খুচরো ক্ষেত্রে মোট বিক্রির ৬৩ শতাংশ জুড়ে রয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের তা ১৪ শতাংশ। মোট কর্মসংস্থানের ৭ শতাংশ এই ক্ষেত্র থেকেই হয় (গুরুস্বামী, ২০০৫)। ভারতীয় পরিবারের উপার্জনের ৪৮ শতাংশই খাদ্য ও পানীয় কিনতে ব্যয় করা হয়, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ (ম্যাকিনসে, ২০০৭)। এই সব কেনাকাটির সিংহভাগই হয় ছোট ছোট দোকান থেকে।

১৯৯১ সালের কৃষিপণ্য বাজার কমিটি আইন (এপিএমসি) অনুসারে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল সরাসরি খুচরো ব্যবসায়ী বা উপভোক্তাদের কাছে বিক্রি করতে পারে না। তাকে বাধ্যতামূলকভাবে ফসল বিক্রি করতে হয় রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদের অনুমোদিত বাজারে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী বা মধ্যস্বত্বভোগীকে। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা কার্যত এক সংঘের রূপ নিয়েছে। খুচরো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা যে দাম নেয় তাতেই খাদ্যদ্রব্যের খুচরো বাজারে তাদের একচেটিয়া আধিপত্যের প্রমাণ মেলে। এর সঙ্গে সরকারি কর, আন্তঃরাজ্য পরিবহণ ব্যয় এবং এজেন্টদের কমিশন যোগ হওয়ায় দাম আরও বেড়ে যায়। এই ব্যবস্থায় দরিদ্র কৃষক ও উপভোক্তাদের বঞ্চিত করে মুনাফা ভোগ করে মধ্যস্বত্বভোগীরাই।

খাদ্যদ্রব্যের মাত্রাছাড়া দাম নিয়ন্ত্রণে ফল ও শাকসবজিকে এপিএমসি আইনের তালিকা থেকে বাদ দিতে কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যকে অনুরোধ করেছে। কিন্তু কেবল এই প্রয়াসই যথেষ্ট নয়। বিদেশি সংস্থাগুলি দোকান স্থাপন করলে সরবরাহ শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য কমবে, কৃষকরা মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি পাবে এবং উপভোক্তার দেওয়া দামের আরও বেশি অংশ তাদের কাছে যাবে (ঘোষাল ও শ্রীনিবাস, ২০১১)। কোহলি ও ভগবতী (২০১১) মনে করেন,

বহুজাতিক সংস্থাগুলি খুচরো ব্যবসায়ে এলে ভারতে সরবরাহ ব্যবস্থার দক্ষতা ও সুফল বাড়বে।

বহু-পণ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিদেশি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ভারতে বড় বড় সুপারস্টোর খুলতে চায়। বহুসংখ্যক মধ্যবিত্তের উপস্থিতিতে ভারতের মতো বিকাশশীল অর্থনীতির খুচরো ক্ষেত্র তাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই ক্ষেত্রের বিকাশ হলে পাড়ার ছোট দোকানগুলি প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। এর কারণ হল, দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই দরিদ্র। সুপারমার্কেটে যাবার মতো পরিবহণের সুবিধা বা একসঙ্গে অনেকটা জিনিস কিনে তা রেফ্রিজারেটরে রাখার মতো অবস্থা তাদের নেই। ভারত সম্পর্কে বলা হয়, এ এমন এক বৃহৎ দেশ, যেখানে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষ এবং কিছু অত্যন্ত ধনীর সহাবস্থান। সেজন্যই এখানে খুচরো ব্যবসার ক্ষেত্রে বিদেশি সংস্থা ও পাড়ার ছোট দোকান—দুইয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতে খুচরো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে বিতর্ক

ভারতে উদারীকরণের যুগের এক তাৎপর্যপূর্ণ নীতিগত বৈশিষ্ট্য হল, শর্তসাপেক্ষে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিধিনিয়ম শিথিল করা। নতুন সরকার অবশ্য বহু-পণ্যের খুচরো ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধী। এতে দেশীয় ছোট সংস্থা ও খুচরো দোকানদারদের জীবিকা বিপন্ন হবে বলে সরকারের ধারণা। তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে, এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন, বরং বহু-পণ্যের খুচরো ব্যবসাক্ষেত্র বিদেশি সংস্থাগুলির সামনে উন্মুক্ত করে দেবার পক্ষেই যুক্তি বেশি। বিদেশি সংস্থা এলে একদিকে যেমন দেশের কৃষিক্ষেত্রের দক্ষতা ও সমতা বাড়বে, তেমনি উপভোক্তারাও উপকৃত হবেন। এর সুফল প্রাথমিকভাবে শুধু উচ্চবিত্তরা পেলেও দীর্ঘমেয়াদে নিম্ন আয়ের মানুষজনের কাছেও তা পৌঁছবে। এখানে দুটি প্রধান যুক্তি নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, আগেই বলা হয়েছে, ভারতের খুচরো ক্ষেত্র সংগঠিত ও অসংগঠিত, এই দুটি ভাগে বিভক্ত। সংগঠিত ক্ষেত্রে বড় দোকানগুলি এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে প্রচুর ছোট দোকান রয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্র পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন। দুটি ক্ষেত্রেরই নিজস্ব গ্রাহক রয়েছে এবং এক ক্ষেত্রের গ্রাহক কখনওই অন্য ক্ষেত্রে যায় না। দ্বিতীয়ত, বহুজাতিক সংস্থাগুলি কৃষিক্ষেত্রে এলে দক্ষতা বাড়বে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত হবে।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ পাড়ার ছোট দোকানের সামনে বিপদ—এক অমূলক আশঙ্কা

অর্থনৈতিক বিকাশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ভূমিকা নিয়ে বহু গবেষক কাজ করেছেন (বাজপাই ও সাচস, ২০০০, লেনসিঙ্ক ও মরিসে, ২০০১)। এজন্য আবশ্যক শর্তগুলি নিয়েও গবেষণা হয়েছে (মেলর, ১৯৭৬, হ্যানসেন, ২০০৪)। কিন্তু ভারতের মতো বিকাশশীল দেশে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, অর্থনৈতিক বিকাশের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ যাতে দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে, তা সুনিশ্চিত করা।

ছোট মুদিখানার ওপর সুপারমার্কেটের প্রভাব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। প্রতিক্রিয়া মিশ্র। সোবেল ও ডিন (২০০৮) দেখিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ালমার্টের জন্য সে দেশের খুচরো ব্যবসায়ীদের ওপর দীর্ঘমেয়াদি কোনও প্রভাবই পড়েনি। আবার জিয়া (২০০৮) ও বাস্কারের (২০০৫) প্রতিবেদনে খুচরো বিক্রেতার সংখ্যা কমে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইগামির (২০০৮) সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সুপারমার্কেটের দরুন বড় ও মাঝারি দোকানগুলির ক্ষতি হলেও ছোট দোকানের অস্তিত্বরক্ষার হার বেশি। দোকানের আকারের জন্য দ্রব্যের বিভিন্নতা এবং দামের প্রতিযোগিতা কম থাকা ছোট দোকানগুলির সুরক্ষাকবচ হয়ে উঠেছে (অ্যান্ডারসন ১৯৯২, পারলক্ষ ও সালপ ১৯৮৫)। ইগামি দেখিয়েছেন, দোকানভেদে উপভোক্তার চাহিদা ও রুচির কতটা পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন আয়তনের দোকান ক্রেতাদের বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য দেয় বলে তাঁর অভিমত। বালাসুব্রমনিয়ামের (২০১৩) বক্তব্য হল, নিম্ন আয়ের উপভোক্তারা দাম ও রাখার জায়গা নিয়ে সমস্যার কারণে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য আদৌ চান না। উচ্চ আয়ের উপভোক্তাদের চাহিদা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিশাল সুপারমার্কেটগুলো সাধারণত শহরের উপকণ্ঠে বা শহরতলিতে গড়ে ওঠে। শহরের কেন্দ্রস্থলে জায়গার অভাব ও জমি ভাড়ার আকাশছোঁয়া হার এর প্রধান কারণ। গত তিন বছরে শহরের কেন্দ্রস্থলে কোনও জমির ভাড়া ৫০ শতাংশ বেড়েছে যা আন্তর্জাতিক ভাড়াবৃদ্ধির হারের তুলনায় ৩০০-৪০০ বেসিস পয়েন্ট বেশি, খুচরো ক্ষেত্রে বিক্রি থেকে আয়ের ৪০ শতাংশের সমান। দেখা গেছে, নিম্ন আয়ের মানুষজন অতটা পথ উজিয়ে, যাতায়াতের জন্য খরচ করে সুপারমার্কেটে যাওয়ার বদলে কেনাকাটার জন্য পাড়ার দোকান ও স্থানীয় বিক্রেতার উপরই নির্ভর করে। ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়তে থাকলেও এখনও তা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশেরও কম (ডয়েশ ব্যাংক, ২০১০)। অন্যদিকে ২১.৯ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্রসীমার নীচে (যোজনা কমিশন, ২০১২)। তাই ভারতে সংগঠিত ও অসংগঠিত—দুই ধরনের খুচরো বিক্রেতারই চাহিদা রয়েছে।

কোহলি ও ভগবতী (২০১১) মনে করেন, বৃহৎ খুচরো ব্যবসায়ের প্রসারের অর্থ পাড়ার ছোট দোকানের অবলুপ্তি নয়। পাড়ার দোকানগুলির অধিকাংশই পরিবার-পরিচালিত, কম পুঁজির, যেখানে বাড়ির একটা অংশই দোকানে পরিবর্তিত। এই দোকানগুলি স্থানীয় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উপভোক্তাদের চাহিদা মেটায়, তাদের ধারে পণ্য বিক্রি করে, পছন্দ না হলে কেনা পণ্য ফেরত নেয় বা বদল করে দেয়, এমনকী কেনার বিষয়ে তাদের পরামর্শও দেয়। প্রহ্লাদ (২০০৮) বলেছেন, 'পিরামিডের সর্বনিম্নে থাকা' এই ক্রেতারা পাড়ার দোকান থেকেই বরাবর তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কেনে। অন্য জায়গায় যাওয়ার খরচ বহন এবং একসঙ্গে অনেকটা

জিনিস কিনে ঘরে তা মজুত করে রাখা—দুই-ই তাদের সাধ্যের বাইরে।

কোহলি ও ভগবতী (২০১১) এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। ভারতে এখনও যৌথ পরিবার প্রথা রয়েছে। সাধারণত এই সব পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা, যাঁরা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, তাঁরাই প্রতিদিনের বাজার করার দায়িত্ব নেন। এই প্রবীণরা পাড়ার দোকানেই যান, সেখানে অন্য সমবয়স্করাও আসেন। কেনাকাটির ফাঁকে যে আড্ডা জমে ওঠে, তার আকর্ষণও এঁদের কাছে কম নয়। যাঁরা আসতে পারেন না, তাঁদের দ্রব্যসামগ্রী বাড়িতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও এই দোকানগুলিতে রয়েছে।

খুচরো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ—কৃষকদের সমতা ও দক্ষতার উৎস

খুচরো ক্ষেত্রে ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা সবথেকে বেশি অবহেলিত। রাষ্ট্রের স্থাপন করা বাজার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা সহায়তার বদলে তাদের বঞ্চনার শিকার করে তোলে। বিদেশি সংস্থাগুলি এলে তারা এই প্রান্তিক কৃষকদের কল্যাণে কী করতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং দারিদ্রের ওপর তার প্রভাব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলেও (অ্যারন, ১৯৯৯ ও ব্যানিস্টার, ২০০১) গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র মানুষের কল্যাণে একে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করা হয়নি। এক্ষেত্রে প্রহ্লাদের গবেষণা ব্যতিক্রমী। বিদেশি সংস্থাগুলি কীভাবে দরিদ্র উপভোক্তাদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, তাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকা দামে পৌঁছে দিতে পারে, তা নিয়ে প্রহ্লাদের কাজ সর্বজনবিদিত। প্রহ্লাদ বিদেশি সংস্থা ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে সরবরাহকারী-উপভোক্তা সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বিদেশি সংস্থাগুলি উৎপাদনের কাজে দরিদ্র কৃষকদের অনেক বেশি সাহায্য করতে পারে বলে তাঁর অভিমত। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলির মূল লক্ষ্য মুনাফার সর্বাধিকীকরণ। তাই তারা দারিদ্র দূরীকরণের মতো সামাজিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে, এমনটা আশা করাই যায় না। ঠিকই, কিন্তু এটাও সত্য যে, মুনাফার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়েও তারা সামাজিক অবদান রাখতে পারে। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্রের মধ্যে রয়েছেন, সেখানে এটা আরও বেশি কার্যকর। বিপুল সংখ্যক উপভোক্তার চাহিদা এক্ষেত্রে যে বিশাল বাজারের সৃষ্টি করেছে, বিদেশি সংস্থাগুলির কাছে তা অত্যন্ত আকর্ষক। এছাড়া কম উপার্জনের এই উপভোক্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুললেও বিদেশি সংস্থাগুলি লাভবান হবে। কারণ, এই উপভোক্তারা একই সঙ্গে উৎপাদকও বটে। অনুন্নত প্রযুক্তিতে, উপকরণের দীনতায়, উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার পাওয়া নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তার মধ্যে এরা উৎপাদন করে চলে। এই কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি, বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহ করে বিদেশি সংস্থাগুলি নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর পাশাপাশি তাদের কল্যাণসাধন করতে পারে। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি যুগে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে সহজেই পৌঁছনো সম্ভব। স্লাইড শো ও তথ্যচিত্রের সাহায্যে তাদের নতুন প্রজাতির বীজ, সার প্রভৃতির কার্যকারিতা এবং উপকারিতা বোঝানো সম্ভব।

ভারতে হিন্দুস্থান লিভার, পেপসির মতো বিদেশি সংস্থাগুলি দরিদ্র কৃষকদের সঙ্গে যেভাবে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে, তাতে উভয়পক্ষই লাভবান হচ্ছে।

উপসংহার

ভারতে খুচরো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে যে বিতর্ক, এই নিবন্ধে তার পর্যালোচনা করা হল, বিদেশি সংস্থাগুলি খুচরো ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে ছোট বিক্রেতারা জীবিকা হারাবেন—এই আশঙ্কার স্বপক্ষে প্রমাণ মেলেনি। দ্বিধাবিভক্ত খুচরো ক্ষেত্রে পাড়ার ছোট দোকানগুলি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত এবং সুপারমার্কেট উচ্চবিত্ত উপভোক্তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এক্ষেত্রে কোনও পক্ষেরই অসুবিধা হবে না, কেউ অপরের এলাকায় দখলদারীও চালাবে না। সব থেকে বড় কথা হল, বিদেশি সংস্থাগুলি দরিদ্র কৃষকের কাছে উন্নত প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতি পৌঁছে দিতে পারে এবং পূর্বনির্ধারিত দামে উৎপাদিত পণ্য কিনে নিয়ে কৃষককে সুনিশ্চিত বাজারের আশ্বাস দিতে পারে।❑

[লেখক ল্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত।
email : Leenakaushal123@gmail.com]

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সংযোগ

রাজ্যের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত

বিশ্বায়নের যুগে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকাও ক্রমশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এই নিবন্ধে লেখক **ত্রিদিবেশ সিং মাইনি** *তা তুলে ধরেছেন। রাজ্যগুলির পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এ সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি অসম বিকাশ কীভাবে সার্বিক সর্বাত্মক উন্নয়নে রূপান্তরিত হতে পারে, তার দিশানির্দেশ রয়েছে এই লেখায়।*

সূচনা

ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয়। তবে অর্থ-নৈতিক সংযোগসাধনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা ধীরে ধীরে স্বীকৃতি পাচ্ছে—বিশেষত যখন রাজ্যগুলি বিনিয়োগকারীদের সম্ভাব্য গন্তব্য হিসাবে নিজেদের তুলে ধরছে। অর্থনৈতিক বিষয়সহ বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে, তাই নিয়েও চলছে জোরদার বিতর্ক।

ভারতীয় সংবিধানে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। ২৪৬ ধারায় সপ্তম তপশিলে কেন্দ্রীয় তালিকায় বিদেশনীতি সম্পর্কিত অন্যান্য যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল :

(১) বিদেশনীতি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়, যা রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের সম্পর্ক সূচিত করে।

(২) কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প সংক্রান্ত প্রতিনিধিত্ব।

(৩) রাষ্ট্রসংঘ।

(৪) আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং সেখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করা।

(৫) বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর এবং সেই চুক্তি, সমঝোতা বা সনদের রূপায়ণ।

সংবিধান যে সময়ে রচিত হয়, তার থেকে, এখনকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা সম্পূর্ণ পৃথক। বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সংযোগ ক্রমশই গভীর হচ্ছে এবং বিভিন্ন কারণে এই সংযোগ এখন আর কেবল দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ নয়।

বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা

যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারত পথ চলছে, তাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলি প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। তাই বহির্বিশ্বের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপনে রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলিকে আরও স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে রাজ্যগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার এক পরিবেশ গড়ে তুলতেও কেন্দ্র সচেষ্ট।

চলতি বছরের অক্টোবরে ইন্দোরে আয়োজিত মধ্যপ্রদেশ বিনিয়োগকারী শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "দেশে দশ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যগুলিকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে।"

নতুন দিল্লিতে সেপ্টেম্বরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির সূচনার সময়েও প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির একযোগে কাজ করার ওপর জোর দেন। "রাজ্যগুলির উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ আকর্ষণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে। রাজ্যগুলির উন্নয়নের অর্থ দেশের বিকাশ।"

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়েই নরেন্দ্র মোদী বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পগত ও বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির সক্রিয় ভূমিকার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। ২০০৩ সালে তাঁর উদ্যোগে 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সম্মেলনে শুধু শিল্পপতিরাই নন, এশিয়া-আফ্রিকা ও ইউরোপের বেশ কিছু কূটনীতিকও যোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রতিনিধি দল নিয়ে সিঙ্গাপুর, চীন ও জাপান সফরেও গিয়েছিলেন গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী।

সাম্প্রতিককালে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুজরাট একেবারে সামনের সারিতে রয়েছে। রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীদের এই নতুন ভূমিকার সূত্রপাত নয়ের দশকে। অর্থনৈতিক সংস্কার, তথ্যপ্রযুক্তিতে অভাবনীয় উন্নতি, ভারতের অর্থনৈতিক শক্তি সম্পর্কে প্রবাসী ভারতীয়দের লাগাতার প্রচার—সব মিলিয়ে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভাবমূর্তি বদলাতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং বিশ্বায়ন, এই পরিবর্তনের মূল দুটি চালিকাশক্তি। 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগের ক্ষেত্রে ভারতের অভ্যন্তরীণ

রাজনীতির ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে' শীর্ষক একটি লেখা 'দ্য এশিয়ান সার্ভে'-তে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক জেনকিন্স (২০০৩ : ৬০০) বলছেন, "বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে বিশ্বায়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলি এক জায়গায় এসে মেশে, তত্ত্বগতভাবে এবং ভারতের সাপেক্ষে। এই দুটি ধারণাই কিন্তু স্থির নয়, ক্রমাগত বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশ্বায়নের বিকাশ অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিকাশ তার থেকে কিছুটা মন্থর বটে, কিন্তু তাও থেমে নেই। এর মূলত দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত সংস্কারের মধ্য দিয়ে চলছে। দ্বিতীয়ত, যে রাজনৈতিক সম্পর্কের আধারে কেন্দ্র-রাজ্য আলোচনা চলে, তা পরিবর্তনশীল।"

কোনও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যকে তুলে ধরছেন, এমন নিদর্শন প্রথম দেখা যায় অন্ধ্রপ্রদেশে, চন্দ্রবাবু নাইডুর সময়ে। ১৯৯৭ সালে চন্দ্রবাবু, মাইক্রোসফটের চেয়ারম্যান বিল গেটসের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গেটসকে আকৃষ্ট করে। মাইক্রোসফট চেয়ারম্যান তাঁর সংস্থার প্রথম ভারতীয় কেন্দ্র স্থাপন করেন তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশ, অধুনা তেলেঙ্গানার রাজধানী হায়দরাবাদে। এই উদ্যোগ ধীরে ধীরে শহরকে 'আইটি হাব'-এ রূপান্তরিত করে, হায়দরাবাদ পরিচিত হয়ে ওঠে 'সাইবারাবাদ' নামে। ২০০১ সালে 'দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'-তে "The Iconization of Chandrababu : Sharing Sovereignty in India's Federal Market Economy" শীর্ষক লেখায় রুডল্‌ফ ও রুডল্‌ফ চন্দ্রবাবু নাইডু এবং কর্ণাটকের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এসএম কৃষ্ণের উদাহরণ দিয়েছেন। দু'জনেই নিজেদের শহরকে সম্ভাব্য হাবে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। গত দু'দশকে রাজ্যগুলি কীভাবে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হয়েছে, এ তারও এক নিদর্শন। মোদী ও কৃষ্ণের এই আগ্রাসী প্রয়াসে তাঁদের রাজ্য যে শুধু তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়েছে তাই নয়, এই সাফল্য নজর কেড়েছে অন্যান্য রাষ্ট্রেরও। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ ২০০০ সালে এবং তাঁর উত্তরসূরি বিল ক্লিন্টন ২০০৬ সালে হায়দরাবাদ সফরে আসেন। প্রাক্তন চীনা প্রধানমন্ত্রী লি পেঙ ব্যাঙ্গালোর সফর করেন ২০০১ সালে।

রাজ্য বিনিয়োগকারী সম্মেলন

২০০৩ সালে 'ভাইব্রান্ট গুজরাট' সম্মেলনের পর এই ধাঁচের বিনিয়োগকারী সম্মেলন আয়োজনে এগিয়ে আসে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ত্রিপুরার মতো বিভিন্ন রাজ্য। এদের প্রকৃতি ও মূলগত জোরের জায়গা অবশ্য আলাদা। ২০১২ সালে বিহার বিনিয়োগকারী সম্মেলনে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাবুরাম ভট্টরাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ভৌগোলিক সুবিধা রয়েছে এমন হাতে গোনা কয়েকটি অঞ্চলই শুধু নয়, সর্বাত্মক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের সব এলাকার বিকাশে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

২০১৩ সালে পাঞ্জাব বিনিয়োগকারী সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় শিল্পপতিদের রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। এর সঙ্গেই হয় প্রবাসী পাঞ্জাবি সম্মেলন, যাতে প্রবাসী পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী এবং কানাডার পাঞ্জাবি বংশোদ্ভূত রাজনীতিকরা যোগ দিয়েছিলেন।

এই ধরনের সম্মেলন ছাড়াও এখন মুখ্যমন্ত্রীরা প্রতিনিধি দল নিয়ে বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। সম্প্রতি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর রাও, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সিঙ্গাপুরে যান। ২০১৩ সালে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া চীনে গিয়েছিলেন।

বিদেশি লগ্নি আকর্ষণ ছাড়াও রাজ্য নেতারা ঋণ লাভের জন্য বিশ্ব ব্যাংকের মতো বহুমুখী আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা—WTO-র সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষত কৃষি সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে যোগ দিয়েছেন।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা অনেকটাই বেড়েছে। এই ভূমিকা আরও বাড়ানো দরকার।

অর্থনৈতিক কূটনীতি আরও কার্যকর করে তোলা

ভারতকে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু খামতি রয়ে গেছে। এর সংশোধনে শুধু নীতিগত পরিমার্জনই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন।

প্রথমেই বলতে হয় সরকারি ছাড়পত্র এবং রপ্তানি কাউন্সিলগুলির ভূমিকার কথা। প্রধানমন্ত্রী পদ্ধতি সরলতর করার পাশাপাশি রাজ্যগুলির রপ্তানি পর্ষদের হাতে আরও বেশি ক্ষমতা দেবার কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় বিষয় হল অসাম্য। দেশের কয়েকটি রাজ্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধা ভোগ করলেও অন্য রাজ্যগুলি এ থেকে বঞ্চিত। ভৌগোলিক অবস্থানজনিত সুবিধার কারণে মহারাষ্ট্র, নতুন দিল্লি, গুজরাট ও তামিলনাড়ুই বিদেশি লগ্নির সিংহভাগ পায়। 'ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহে আঞ্চলিক অসাম্য: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি লেখায় মুখার্জি জানিয়েছেন, "এপ্রিল ২০০০ থেকে জুন ২০১২ সময়কালে ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৭০ শতাংশেরও বেশি গেছে শীর্ষস্থানীয় ছ'টি রাজ্য মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশে।

এই সমস্যা সমাধানের কোনও চটজলদি উপায় নেই। পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে আরও বেশি করে সাহায্য করতে হবে। চীন অনেকটা পারলেও ভারত এখনও তার পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করতে পারেনি। বিহার ও মধ্যপ্রদেশ দ্রুত গতিতে উন্নয়নের পথে এগোলেও বিনিয়োগকারীদের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠতে তাদের এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। আরও বেশি মনোযোগ

দেওয়া দরকার পূর্ব ভারত ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওপর। সম্প্রতি বারাণসীতে একটি বাণিজ্য সহায়ক কেন্দ্রের শিলান্যাসের পর তন্তুবায়দের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী এই দুটি অঞ্চলের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, শুধু পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতিই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সমবিকাশ একান্ত আবশ্যক।

'ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে আন্তঃরাজ্য অসমতার নির্দেশক' শীর্ষক এক সমীক্ষায় এস চ্যাটার্জি, পি মিশ্র এবং বি চ্যাটার্জি অসমতার কারণ হিসাবে দেশীয় লগ্নি টানায় সাফল্য, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাতে পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য বৃহৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তা সুনিশ্চিত করা উচিত। বিশেষত মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনের পর এই অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব অনেকটাই বাড়তে চলেছে। অনুন্নত অঞ্চলে দেশীয় বিনিয়োগ বাড়লে পরিকাঠামো ও বাজারগত সুযোগ-সুবিধার বিকাশ ঘটে। তাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আকৃষ্ট হন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ঘটলে শুধু যে 'সেভেন সিস্টার্স' নামে খ্যাত সাতটি প্রান্তিক রাজ্যের উন্নয়ন হবে তাই নয়, উপকৃত হবে অন্যান্য রাজ্যও, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ। কৌশলগত অবস্থানের সুবিধায় কলকাতা হয়ে উঠবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ম্যানুফ্যাকচারিং হাব। বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করতে পশ্চিমবঙ্গ এখন তৎপর। চীনের ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিঙের সঙ্গে কলকাতা যমজ শহরের সম্পর্ক পাতিয়েছে। আগ্রাসী বিপণন এবং বার্ষিক চীন-দক্ষিণ এশিয়া মেলা আয়োজনের সুবাদে কুনমিঙ এখন মায়ানমারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, যে সব রাজ্য বিদেশি লগ্নি আকর্ষণে তৎপর, তাদের বিদেশের মাটিতে নিজস্ব বাণিজ্য কার্যালয় খোলার অনুমতি দেওয়ার সময় এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান বহুদিন থেকেই তাদের প্রদেশগুলিকে এই অনুমতি দিয়ে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী অজস্রবার এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। তবে এর রূপায়ণ এমনভাবে হওয়া উচিত, যাতে তা অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হয়। প্রতিটি রাজ্য আলাদাভাবে অফিস না খুলে সম্মিলিতভাবেও কার্যালয় স্থাপন করতে পারে। 'বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলির বাণিজ্য কার্যালয়ের অবস্থান' শীর্ষক গবেষণায় অ্যান্ড্রু জে ক্যাসে দেখিয়েছেন, 'কাউন্সিল অব গ্রেট লেক স্টেটসের উদ্যোগে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিলি, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অফিস খোলা হয়েছে। কাউন্সিলের সদস্য রাজ্যগুলি অর্থাৎ ইলিনয়েস, ইন্ডিয়ানা, মিশিগান, মিনেসোটা, নিউইয়র্ক, ওহায়ও, পেনসিলভেনিয়া, উইসকনসিন—যে কেউ এই অফিসগুলি ব্যবহার করতে পারে।

ভারতও এই রকম যৌথ অফিস স্থাপনের কথা ভাবতে পারে। যেসব দেশের সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যগত সম্পর্ক মজবুত এবং যেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি, বিশেষত সেখানে এমন কার্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন ধরা যাক, গুজরাট ও তামিলনাড়ু মিলে সিঙ্গাপুরে একটি অফিস খুলল। তেমনি কয়েকটি রাজ্য মিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অফিস খোলা যেতে পারে। ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও টেক্সাসে বহু ভারতীয় বাস করেন। প্রতিবেশী দেশগুলিতে যৌথ কার্যালয় স্থাপনের কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি মিলে মায়ানমার ও বাংলাদেশে এমন অফিস খুলতে পারে।

শেষে বলি, রাজ্য বিনিয়োগকারী সম্মেলনগুলিতে জাতীয় স্তরের নেতারা যোগ দিলে এগুলি আরও গুরুত্ব পাবে। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব না হলেও কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর অবশ্যই এই ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা উচিত। বিশেষত তা যদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আয়োজিত হয়।

উপসংহার

অর্থনৈতিক কূটনীতিতে রাজ্যের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন এর একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর করে তুলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি ছাড়াও বণিক সংগঠন, প্রবাসী ভারতীয় প্রমুখ গোষ্ঠীকে এর অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। নিজেদের বিপণনের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আরও উদ্ভাবনী উপায়ের কথা ভাবতে হবে।❑

[লেখক সোনিপতের ওপি জিন্দল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির 'জিন্দল স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স'-এর সিনিয়ার রিসার্চ অ্যাসোশিয়েট।
Email : tsinghmaini2012@gmail.com]

বিকেন্দ্রীভূত কৃষি গবেষণায় আরও ফান্ড

কেন্দ্রীকরণ বনাম বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আকচাআকচি নতুন কিছু নয়। আমাদের দেশে কৃষি গবেষণায় মৌরসিপাট্টা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের। যা কিনা কেন্দ্রীকরণের এক পীঠস্থান। গত ছয়ের দশকের মাঝামাঝি এই কেন্দ্রীকরণ মাথাচাড়া দিতে থাকে। সেসময়ে এর প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। দিনবদলের ক্ষণে বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে জোরালো সওয়াল তুলে ধরেছে **রাজেশ্বরী এস. রায়না, বিশ্বনাথ রেড্ডি, কে. কিংস্‌লী ইম্যানুয়েল রাজ** *এবং* **রমেশ কুমার***-এর এই নিবন্ধ।*

ভারতে কৃষি গবেষণা আরও তুখোড় এবং কেজো করতে চাই বাড়তি টাকাকড়ি। এজন্য গবেষণাখাতে কৃষির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ১ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে (কৃষি কমিটি, ২০১৪)। দ্বাদশ যোজনায় কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা দপ্তরের দাবির ৫০ শতাংশের বেশি ছেঁটে বাজেট অনুমোদন করা হয়। কমিটি এটাও লক্ষ করেছে এত বেশি কাটছাঁট সত্ত্বেও যোজনার প্রথম দু বছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল অনুমোদিত বাজেটের ২৩.২৭ শতাংশ মাত্র। সামান্য এই বরাদ্দও কাজে লাগাতে দপ্তর ব্যর্থ। ২০ শতাংশের বেশি টাকা খরচ করা যায়নি। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সেচ ও রাসায়নিক পদার্থের জন্য আগেকার গড়া স্থায়ী সম্পদ নিয়েই বর্তমানের কেন্দ্রীভূত কাঠামো ও গবেষণার বিষয়বস্তু ব্যতিব্যস্ত। এমন অবস্থায় বাড়তি টাকার সংস্থান হলে কার্যকারিতা বাড়বে, এ ধারণা অসাড়। সরকারের কেন্দ্রীভূত লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার স্ট্র্যাটেজি কৃষি গবেষণার অনিষ্ট করছে। কৃষি গবেষণার বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ জরুরি।

ভারতের প্রথম কৃষিনীতির উদ্ভব একুশ শতকে। এই নীতির নিশানা বছরে ৪ শতাংশ বিকাশ হার। এ যাবৎ কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ (গবেষণার সুফল চাষিবাসীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া) এর জন্য দেশে কোনও নীতি বা কাঠামোর অস্তিত্ব ছিল না। লক্ষ্য অর্জনে কর্মকৌশলের দিকে যথেষ্ট নজর না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জাতীয় কৃষিনীতির (ভারত সরকার, ২০০০) বিরুদ্ধে। এসব লক্ষ্যের মধ্যে আছে লগ্নির পরিমাণ, সরকারি ও অসরকারি ভূমিকা, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং জল, বন, সর্বজনীন জমির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা (চাঁদ ২০০৪ ; ধুত ২০০৬) ইত্যাদি। কৃষি-নীতির বিরুদ্ধ সমালোচনার ঢেউ থেকে উঠে এসেছে এক গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ—একটি প্রযুক্তি নীতি গ্রহণ। উপযুক্ত নীতি তৈরি ও সে সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের ভালোরকম ওয়াকিবহাল করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার (চাঁদ)।

উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ভারতের সফল সবুজ বিপ্লব চুকে যায় গত আটের দশকে (ভাল্লা ও সিং, ২০১০)। এখন এই সবুজ বিপ্লবের কাজ চলছে পূর্বাঞ্চলে। ডাল, তুলো, মোটা দানাশস্য, ফলফুল, শাকসবজি, হাঁস-মুরগি ও মাছের ইদানীং নজির ভাঙা উৎপাদনের তারিফ করতে হয়। সেচ-রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের বহুল ব্যবহারের উপর নির্ভর প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর সাফল্য কিন্তু ক্রমশ ফিকে। আর সেইসঙ্গে পরিবেশে ক্ষতির দরুন জবাবদিহির জন্য কৃষি গবেষণা এখন কাঠগড়ায় (বিদ্যানাথন, ২০১০, যোজনা কমিশন, ২০০৮)। উৎপাদনশীলতা নয় দাম বাড়াতেই কৃষির বিকাশ হার বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা প্রমাণিত (চাঁদ, ২০১৪)। প্রশ্ন উঠেছে, এর আগে উৎপাদনে সাফল্য এলেও দেশে পুষ্টির মানে কেন কোনও হেলদোল দেখা যায়নি (গিলেসপি ও অন্যান্য, ২০১২, হাভাড, ২০১১, ডেটন ও দ্রেজে, ২০০৯)। কৃষি গবেষণার পরিচালনা ও বিষয় নিয়ে তাই উদ্বেগের হেতু আছে বইকী। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক বেসরকারি সংস্থার বাড়বাড়ন্ত, ঋণ মেলা ও তার সদ্ব্যবহার, মাটির নীচে জলস্তর দ্রুত নেমে যাওয়া (সেচের জন্য জলের ৭০ শতাংশ তোলা হয় মাটির তলা থেকে) এবং চাষিদের আত্মহত্যা নিয়ে আশঙ্কা অহেতুক নয়। প্রযুক্তি সঠিক কাজে লাগানোর ব্যর্থতার জন্য এক্সটেনশন বা সম্প্রসারণে (গবেষণার সুফল চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া—ল্যাব টু ল্যান্ড) খামতির দিকে আঙুল ওঠে হামেশাই (জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, ২০০৭)। গ্রামে পরিকাঠামোর অভাব, নিরক্ষরতা ও ছোটখাট চাষিদের ঝুঁকি নেবার অক্ষমতা তো আছেই। আর চাষের জমির ৮৪ শতাংশে চাষবাস চালায় এই চাষিরা (যোজনা কমিশন, ২০১১)। জলবায়ু হেরফেরের প্রভাব পড়ে কৃষিতে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষিকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য চাই আরও বেশি বিকেন্দ্রীভূত ও অঞ্চল-নির্দিষ্ট গবেষণা (রায়না, ২০১২)।

কৃষি গবেষণা ও বিকাশ

ভারতে কৃষি গবেষণা ব্যবস্থার প্রায় পুরোটা সরকারের আওতায়। গবেষণা ও কিছু উচ্চশিক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে আছে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ। রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলত শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামায়। সেইসঙ্গে, কিছু গবেষণা ও এক্সটেনশন এডুকেশন (গবেষণার ফল চাষিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সংক্রান্ত শিক্ষা) এর ভার নেয়। কৃষি, পশুপালন, মাছচাষ, ফলফুল, শাকসবজি, জমি-জল সংরক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ বা এক্সটেনশন-এর কাজ চালায় রাজ্যের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি। জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে রাজ্যের চাহিদা মেটাতে একত্রিতভাবে গবেষণা, শিক্ষা এবং সম্প্রসারণ শিক্ষার দায়িত্ব রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির।

ফসলের সহায়ক মূল্য ও উপকরণে ভরতুকি—দুই খুঁটির ওপর এখন ভর দিয়ে আছে ভারতের কৃষি (রায়, ২০০৭; বৈদ্যনাথন, ২০১০)। সবুজ বিপ্লব চালু ও সরকারের উদ্যোগে মূলধনি সম্পদ তৈরির (সেচে ৯০ শতাংশের বেশি) বছর কয়েক পর চাষিরা কৃষির জন্য প্রণীত জাতীয় কর্মকৌশলে সাড়া দেয়। (সুব্রমনিয়াম, ১৯৭২; বৈদ্যনাথন, ২০১০)। তারা পালটে ফেলে জমি ব্যবহারের ধাঁচ। নিবিড় চাষে নজর দেয়। গম ও ধান চাষে সেচের ব্যবস্থা করে আরও বেশি জমিতে। আটের দশকের মাঝামাঝি দেখা গেল সেচে ব্যক্তিগত পুঁজি খাটানোয় বাড়তি আগ্রহ (অগভীর নলকূপ বসতে লাগল চারদিকে—এ দশকের শেষ পর্যন্ত দানাশস্যে সেচে ৭০ শতাংশের বেশি মেটায় মাটির তলার জল)। চাষে উৎসাহ দিতে নলকূপ, সার, কীটনাশক ও বীজে ভরতুকি বাড়ানো হল। ১৯৮৩ নাগাদ শেষ হওয়া সবুজ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে কৃষিতে সরকারের উদ্যোগে মূলধনি সম্পদ তৈরির বিস্তারে পড়ল ভাটা। ১৯৮০-৮১-এ মোট মূলধনি সম্পদ তৈরিতে কৃষির মোট মূলধনি সম্পদ তৈরির অংশভাগ ছিল ২০ শতাংশ। তা ১৯৯৯-২০০০-এ কমে ১০ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০৭-০৮-এ আরও কমে ৬ শতাংশ। অবশ্য ২০০৯-১০-এ কিছুটা বেড়ে হয় ১০ শতাংশ। ২০১১-১২-তে ফের কমে ৭.২ শতাংশ।

উপকরণ উৎপাদন ও জোগানের জন্য পুঁজি লগ্নির ওপর কৃষি বিকাশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে (বিশেষত গত সাতের দশক থেকে)। ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বা কৃষির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন-এর সূচকের তুলনায় উপকরণ ব্যবহারের সূচক দ্রুত বেড়ে যায়। রাসায়নিক সার প্রয়োগের সূচক ঢের পিছনে ফেলে দিয়েছে নিবিড় চাষ, সেচ ও দানাশস্য উৎপাদন সূচককে। উপকরণের চড়া দাম এবং মূলধন উৎপাদন অনুপাত অত্যন্ত বাড়ায় ছোটখাট চাষিরা উৎপাদন ব্যয় সামাল দিতে জেরবার (চাঁদ ও অন্যান্য, ২০১১)।

ফসলের সহায়ক মূল্য ও উপকরণে ভরতুকি, এই জোড়া নীতি এবং সেচ ও সারে লগ্নির ফলশ্রুতিতে কৃষি গবেষণার নজর একমাত্র সেচ এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর উৎপাদন প্রযুক্তির দিকে। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। এসব বিচ্যুতি শুধরোতে কৃষি গবেষণায় সংস্কার আনার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর বলে

চিত্র-১
কৃষি উৎপাদন ও উপকরণ প্রধান সূচক (১৯৭০-৭১ থেকে ২০১১-১২)
(১৯৯০-৯১ = ১০০)

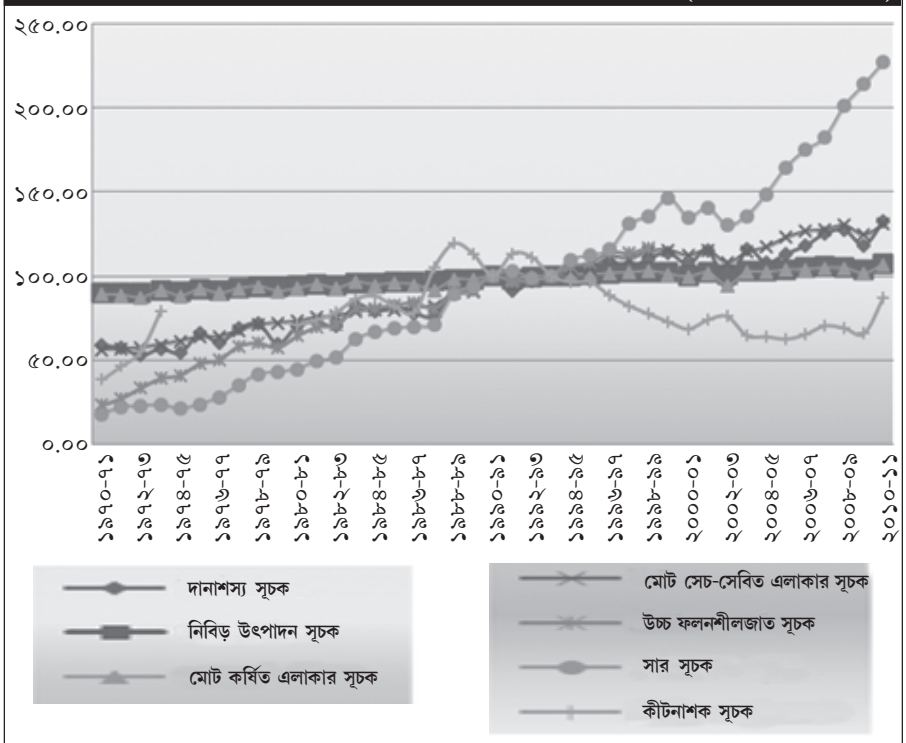

সূত্র : অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান নির্দেশালয়।

চিত্র-২
কৃষি, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য উপক্ষেত্রে পরিকল্পনা ব্যয়ের ধারা
(মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের শতকরা ভাগ)

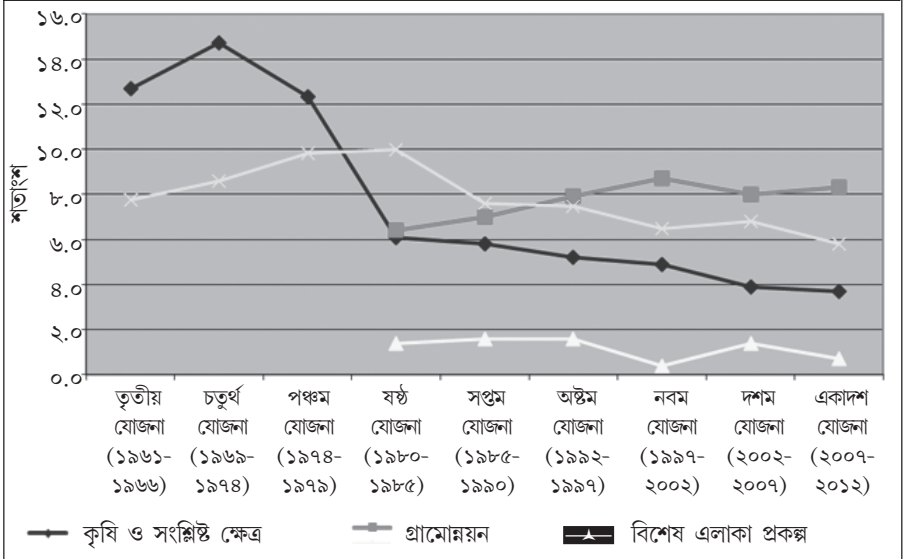

সূত্র : যোজনা কমিশন ও অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান নির্দেশালয় এবং রায়না (২০১৪)।

অনেকে হা-হুতাশ করে থাকে (যোজনা কমিশন, ২০০৮)।

উৎপাদন বৃদ্ধি থেকে সরে এসে পরিবেশ ও অর্থনীতির সুস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যমূলক গবেষণা স্ট্রাটেজি নিলে কৃষিতে আরও বেশি যোজনা বরাদ্দ দরকার। টাকার অঙ্কে যোজনা বরাদ্দ আগের চেয়ে বেড়েছে। কিন্তু যোজনা ব্যয়ে কৃষির অংশভাগ ক্রমশ কমেছে (রেখাচিত্র-২)। কৃষিতে মূলধনি সম্পদ তৈরির জন্য প্রচুর সরকারি লগ্নির সঙ্গে সামঞ্জস্য সুনিশ্চিত করতে যোজনা-বহির্ভূত বিনিয়োগ অবশ্য ঠিক রাখা হয়েছে (কৃষি-মন্ত্রক, ২০০৩)। পরিবেশ ও উৎপাদন সংক্রান্ত উত্থিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতি কর্মসূচির ভাবনাচিন্তা, পরিকল্পনা ও রূপায়ণের ক্ষমতায় পড়েছে ভাটা।

ভারতে কৃষি গবেষণার কেন্দ্রীকরণ

বিকেন্দ্রীভূত কৃষি-পরিবেশ জ্ঞান পরিকাঠামোর ভিত্তিতে স্থায়ী সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণার মৌল তত্ত্বে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ মানতে হলে কৃষি ব্যবস্থার জৈব-পদার্থ এবং সমাজ-অর্থনীতি সংক্রান্ত পটভূমির ধারণা থাকা জরুরি। শুধুমাত্র জৈব-পদার্থ চলকের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চল থেকে এই ক্ষমতা ভিন্নতর। এর জন্য দরকার বিকেন্দ্রীকৃত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও তা প্রয়োগের দক্ষতা। কিন্তু ভারতে কৃষি গবেষণা কাঠামো ও বিষয়ের এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা।

১৯৬০-৬১-তে কৃষি গবেষণাবাবদ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যয় (শিক্ষা ও সম্প্রসারণ-খাতে খরচ না ধরে) ছিল ১৫০ কোটি টাকারও কম। তা বেড়ে ২০০৯-১০-এ দাঁড়ায় ৩০০০ কোটি টাকার উপরে (২০০৪-০৫-এর মূল্যস্তরে)। কৃষি উৎপাদন পরিকাঠামো এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা ষাটের দশক পর্যন্ত মূলত রাজ্যগুলির দায়িত্বে ছিল।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের পত্তন ১৯২৯ সালে। পরিষদ একটি নিবন্ধীকৃত সমিতি। গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আরও খাদ্যশস্য উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আধুনিক প্রযুক্তির চাহিদা

সারণি-১
জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যয় (২০০৪-০৫-এর মূল্যস্তরে)
(কোটি টাকা)

বছর	কেন্দ্র	রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল	মোট
১৯৬০-৬১	৫৬.২৭	৮৬.৭৭	১৪৩.০৪
১৯৭০-৭১	২৬১.৯৮	১৮৭.৫৩	৪৪৯.৫১
১৯৮০-৮১	৪৭০.৬৫	২৩৯.৬৩	৭১০.২৮
১৯৯০-৯১	৭৮৪.৬৭	৩২৭.০৫	১১১১.৭২
২০০০-০১	১৪৪৩.৯৫	৫১২.৫৫	১৯৫৬.৫০
২০০৯-১০	২৩০২.৪০	৭৬৫.৯৫	৩০৬৮.৩৫

উৎস : ক্যাগের প্রতিবেদন থেকে হিসেব করা।

সারণি-২
কৃষি গবেষণা ব্যয়

বছর	অনুপাত কেন্দ্র : রাজ্য + কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল
১৯৬০-৬১	৩৯ : ৬১
১৯৬৫-৬৬	২৬ : ৭৪
১৯৭৪-৭৫	৫৯ : ৪১
১৯৭৯-৮০	৬৭ : ৩৩
১৯৯০-৯১	৭১ : ২৯
১৯৯৭-৯৮	৭১ : ২৯
২০০৬-০৭	৭৫ : ২৫
২০০৯-১০	৭৫ : ২৫

মেটাতে এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গড়ার প্রয়োজন ঠাহর করা যাচ্ছিল। অনেক দিন থেকে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ চালিয়ে এলেও এই পর্ব ছিল উৎকণ্ঠায় ঠাসা এবং এ সময় গবেষণাখাতে ব্যয়ের বিকাশ হার কমে যায় (সারণি-৩)।

১৯৬৫-তে শুরু হওয়া দ্বিতীয় পর্বে কৃষিমন্ত্রক ও পণ্য কমিটির তামাম গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আনা হয় ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের ছাতার তলায়। কিছু রাজ্য সরকারের প্রতিষ্ঠানও পরিষদের আওতায় আসে। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তরের একটি বিভাগ হিসেবে এ যাবৎ পরিষদ কিছুটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করত। সেই অধিকার খোয়া গেল। ১৯৭৫-এ পরিষদ পুরোদস্তুর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা দপ্তরে পরিণত হয়। কৃষি গবেষণার যাবতীয় দিক কেন্দ্রীকৃত করার যোলোকলা হল পূর্ণ। মায় সব রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ঠিক করার ক্ষমতাও পেল পরিষদ। এই তৃতীয় পর্ব চলল নব্বইয়ের দশক ইস্তক। বাড়ল গবেষণার বহর। এ সত্ত্বেও, দ্বিতীয় পর্বের তুলনায় কৃষি-গবেষণা ব্যয়ের বিকাশ হার কমই রইল (সারণি-৩)। সবুজ বিপ্লবের সুফল মিইয়ে যেতে শুরু করলেও গবেষণার কলেবর বাড়া কিন্তু থমকে যায়নি (ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, ১৯৯৮; ভাল্লা ও সিং, ২০১০)। এখন চতুর্থ পর্বের পালা। এর সূচনা ১৯৯৭-এ। জলবায়ুর হঠাৎ হঠাৎ হেরফের শুরু হওয়া নিয়ে গবেষণা চালাতে এই পর্বে সম্প্রতি গড়া হয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর বায়োটিক অ্যান্ড অ্যাবায়োটিক স্ট্রেস।

রাজ্যস্তরে কৃষি-নির্ভর ও গ্রামীণ ভারতের জন্য শিক্ষার ধরনধারণ নিয়ে তর্কজালবিস্তার কম হয়নি। ১৯৬০-এ পত্তন হয় প্রথম রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য মডেল আইন (১৯৬৬) চালু হয় ষাটের দশকের শেষ নাগাদ। গবেষণাখাতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি ব্যয় বাড়াচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের হাতে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা দপ্তর জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থা ঠিক করার ক্ষমতা পায়। রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য পাঠক্রম ও নীতিনির্দেশিকা তৈরির ভার নেয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল)। একঢলের গবেষণা ও সম্প্রসারণ শিক্ষা রূপায়ণের দায়িত্বও ন্যাকের। এ পর্বে

রাজ্যগুলির কৃষি গবেষণা ব্যয়ে বিকাশ হার কমে যায় (সারণি-৩)।

নির্দিষ্ট কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চলের কথা মাথায় রেখে গবেষণা চালানোর দাবির দিকে খেয়াল রেখে তৃতীয় পর্ব শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের গোড়ায়। কিন্তু কেন্দ্রীকৃত গবেষণা ব্যবস্থায় ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ সুপরিকল্পিতভাবে রাজ্যের গবেষণা ক্ষমতার দফারফা করেছে (ঝা, ২০০২)। সাতের দশকের শেষ ইস্তক জাতীয় কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা ব্যয়ে মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যের অংশ ছিল প্রায় অর্ধেক। স্থানীয় উৎপাদন প্রণালী নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাও চলে ওই রাজ্যগুলিতে। তারাও কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ কমিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভেঙে পৃথক পৃথক কৃষি, হর্টিকালচার, পশু এবং মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার এক ঝোঁক দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এ শতকে কৃষিবিজ্ঞানে একগোত্রের পাঠক্রম অব্যাহত। কেন্দ্রীকরণের বাড়াবাড়ি ও স্থানীয় সমস্যা গুরুত্ব বা প্রাসঙ্গিকতা না পাওয়ার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন ভাগের বিশ্ববিদ্যালয় গঠন। এটা কিন্তু কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চলভিত্তিক গবেষণা, চাষিদের অংশগ্রহণমূলক গবেষণা, কৃষি প্রণালী গবেষণা এবং সবচেয়ে বড় কথা, জলবায়ু হেরফেরের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য গবেষণার সঙ্গে খাপ খায় না।

মনে রাখা দরকার ষাটের দশকে কৃষি গবেষণার কেন্দ্রীকরণ ঘটে প্রয়োজনের তাগিদে। একুশ শতকে এই কেন্দ্রীকৃত গবেষণা ও বিকাশ তার আগেকার মর্যাদা খুইয়েছে। এ খাতে বাড়তি বিনিয়োগের ব্যাপারটি তেমন পাত্তা পায় না। গত কয়েক বছর তাই ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের বাজেটে কাটছাঁট। পরিষদের মোট বাজেটের (যোজনা ও যোজনা-বহির্ভূত) বিকাশ হার ২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪-য় কমেছে ৩.৯ শতাংশ। গত দশকের ২০০৬-০৭ থেকে ২০১০-১১-তে এই হার ছিল ৯.১৬ শতাংশ। এ সময় অবশ্য ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশমাফিক বকেয়া প্রাপ্যবাবদ খরচ এত বেশি বিকাশ হারের একটা কারণ।

সারণি-৩
কেন্দ্র ও রাজ্যের কৃষি গবেষণা ব্যয় বিকাশের পর্ব
চক্রবৃদ্ধি বিকাশ হার

বছর	সিএজিআর
কেন্দ্র	
১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৫-৬৬	-১.৯৬
১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৭৪-৭৫	৯.৫৩
১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৯৬-৯৭	৭.৪৯
১৯৯৭-৯৮ থেকে ২০০৯-১০	৮.১৫
রাজ্য	
১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৯-৭০	৭.৬৯
১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৮৯-৯০	২.৪১
১৯৯০-৯১ থেকে ২০০৯-১০	৪.৫৮

উৎস : অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান নির্দেশালয়।

সবুজ বিপ্লব সূত্রপাতের সময় এবং এখনও ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি-গবেষণা তেমন একটা আমল পায় না। জাতীয় কৃষি-গবেষণা ব্যয় .০৩৭ শতাংশ ১৯৬৫-৬৬ থেকে ২০০৯-১০-এ দাঁড়িয়েছে জাতীয় মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের .০৬৮ শতাংশ (ক্যাগের তথ্য থেকে হিসেব করা, সারণি-১-এ ব্যবহৃত)। এর মধ্যে অবশ্য কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাবাবদ ব্যয় ধরা হয়নি। কৃষির মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষি গবেষণা ব্যয়ের অংশ .০৯৪ শতাংশ (১৯৬৫-৬৬) থেকে বেড়েছে .৪৪৮ শতাংশ (২০০৯-১০)।

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের ৯৫টি প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দেশের হরেক জায়গায়। অনেক প্রতিষ্ঠানের অঞ্চলিক কেন্দ্র আছে বিভিন্ন কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চলে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় গবেষণা এজেন্ডায় সেচ-রাসায়নিক সার ও কীটনাশক-নির্ভর উৎপাদন-এর প্রাধান্য (ভারত সরকার, ২০০৮; রায়না, ২০১১)। কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট সাংবিধানিক ভূমিকা ক্ষুণ্ণ করছে কৃষি গবেষণার এই কেন্দ্রীকরণ। কৃষি, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ, ফসলের ক্ষতিকারক কীট থেকে সুরক্ষা ও গাছপালার রোগবালাই প্রতিরোধ রাজ্য তালিকায় পড়ে। সংবিধানের কথা ও পরিকল্পিত উন্নয়নে কেন্দ্রীকরণের বাড়াবাড়ি (ঘোষ, ১৯৯২) বিবেচনা করে একাদশ যোজনায় রাজ্যস্তরে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ও পূর্ণাঙ্গ জেলা কৃষি পরিকল্পনা নীতি সংস্কারের ক্ষেত্রে দুটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে তা যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে চাই বিকেন্দ্রীকৃত, কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চলভিত্তিক কৃষি গবেষণা, সমস্যা নির্ণয় করতে সমাজের অংশগ্রহণ, গবেষণায় চাষিদের অংশগ্রহণমূলক অংশীদারিত্ব ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত প্রযুক্তি।

পরিবেশগত ও সামাজিক, বিশেষত পরিবারের আয় ও পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রভাবের কথা মনে রেখে কৃষি গবেষণায় কাঠামো, কাজকর্ম ও বিষয়ে রদবদল দরকার। ফসলের সহায়ক মূল্য ও উপকরণে ভরতুকি, এই দুই নীতিকে ভিত্তি করে বর্তমান গবেষণা ব্যবস্থা গড়া হয়েছে সেই ছয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে। এখন চাই বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। আর তা ব্লক (যোজনা কমিশন, ২০১১) বা প্রশাসনের আরও নীচু স্তর যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের মণ্ডল স্তরে করতে পারলে ভালো হয়।

বিকেন্দ্রীকৃত গবেষণা

জ্ঞানের অগ্রগতি, উৎপাদনশীলতা বিকাশের হার ও গবেষণায় আরও লগ্নির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ এক অন্তরায় বিশেষ। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য স্তরে কৃষি গবেষণার বিবর্তন হলেও (সারণি-৩) কৃষি গবেষণা ও বিকাশে আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ফারাক ফুটে ওঠে।

কৃষি গবেষণা ও শিক্ষায় মোট খরচে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি এগিয়ে। আর পূর্ব ও পশ্চিমের অংশ ক্রমশ কমছে। উত্তরাঞ্চলের ভাগও দ্রুত কমছে। ১৯৭০-৭১-এ উত্তরাঞ্চলের অংশভাগ ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০১০-১১-তে তা মাত্র ১৮ শতাংশ। এমনকী ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের হালও কহতব্য নয়। গবেষণাবাবদ ব্যয়ের অংশ কমছে। বেতন ও গবেষণাখাতে খরচের অংশ যথাক্রমে ৫৫.৫ শতাংশ ও ৩.২ শতাংশ (ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ বাজেট বই, ২০১২-১৩)।

গত চার দশকের বেশি জাতীয় স্তরে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা ব্যয়-এর (কেন্দ্র,

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ধরে) গড় বার্ষিক বিকাশ হার ১ থেকে ১.৪ শতাংশ (সারণি-৩)। দক্ষিণাঞ্চল অবশ্য এই ব্যয়ের হার বাড়িয়ে চলেছে। গত শতকের শেষ দিকে তাদের এই হার ছিল বছরে ১.৫ শতাংশরে বেশি। কৃষি গবেষণা কেন্দ্রীকরণের প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্ট উত্তরাঞ্চলে। চার দশকেরও বেশি সেখানকার রাজ্যগুলিতে ব্যয়ের বিকাশ হার ঘোরাফেরা করেছে মাত্র ১ শতাংশের কাছাকাছি।

দক্ষিণ ভারতে গবেষণায় অগ্রাধিকার বদলে গেছে। ফলফুল, শাকসবজি, মাছ, পশুপালন বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্তরে অর্থবরাদ্দ তুলনায় কম। কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাতেও কিছু রাজ্য গবেষণা ও সম্প্রসারণকে তাদের কাজে লাগিয়েছে। যেমন, একাদশ যোজনায়, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা বরাদ্দের টাকা দিয়ে রাজস্থান চাষিদের ভরতুকি দামে মনস্যান্টোর বা সঙ্কর বীজ জোগান দিয়েছে। আবার মহারাষ্ট্র বরাদ্দের টাকা কাজে লাগিয়েছে চারটি প্রধান ফসলের ক্ষতিকারক কীট দমনে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ওই রাজ্যে ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতায় ২৮টি তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারি কেন্দ্র আছে।

কৃষি রাজ্য তালিকাভুক্ত। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক পরিষেবার পাশাপাশি কৃষি, গ্রামোন্নয়ন ও পরিবহণের মতো অর্থনৈতিক পরিষেবাতেও রাজ্যগুলি বিনিয়োগ করে। এর মধ্যে সম্প্রসারণের জন্য সহায়তাও আছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের সহযোগিতার কথায় ফেরা যাক। ফসলের খেতে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব নিয়ে নজরদারির জন্য স্থানীয় লোকের কর্মসংস্থান, আধুনিক জিনেটিকস, অ্যাগ্রো-মিটিওরলজি ও ইনসেক্ট ফিজিওলজির সঙ্গে কীটপতঙ্গ নিয়ে স্থানীয় জ্ঞানের বিকাশ এবং কীট ব্যবস্থাপনায় উপকরণ ও পরামর্শ জোগাতে স্থানীয় ব্যবসায় সংস্থা গঠনে সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। গবেষণার জন্য এহেন সমাজ সহায়তা মেলার সম্বল নেই কেন্দ্রীকৃত গবেষণা ব্যবস্থার। সংসদ সদস্য, নীতিপ্রণেতা

সারণি-৪
মোট কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা ব্যয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের অংশভাগ
(১৯৭০-৭১ থেকে ২০১০-১১ চলতি মূল্যস্তরে—লাখ টাকায়)

বছর	দক্ষিণ শতাংশ	উত্তর শতাংশ	পশ্চিম শতাংশ	পূর্ব শতাংশ	মোট (১০০ শতাংশ)
১৯৭০-৭১	১২	৩৮	৩২	১৮	৩৪৯৩
১৯৮০-৮১	২২	৩১	২৯	১৭	৮৮১৪
১৯৯০-৯১	২৫	৩১	২৭	১৭	৩৮৬৮৪
২০০০-০১	৩০	২৫	৩৩	১২	১১৫৩২২
২০১০-১১	৩৫	১৮	৩০	১৬	৩৩২৬৪৪

সূত্র : ক্যাগের প্রতিবেদন থেকে হিসেব করা।

চিত্র-৩
কৃষি গবেষণা ও শিক্ষায় কেন্দ্র, উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলির ব্যয়ের বার্ষিক বিকাশ হার
(শতাংশে)

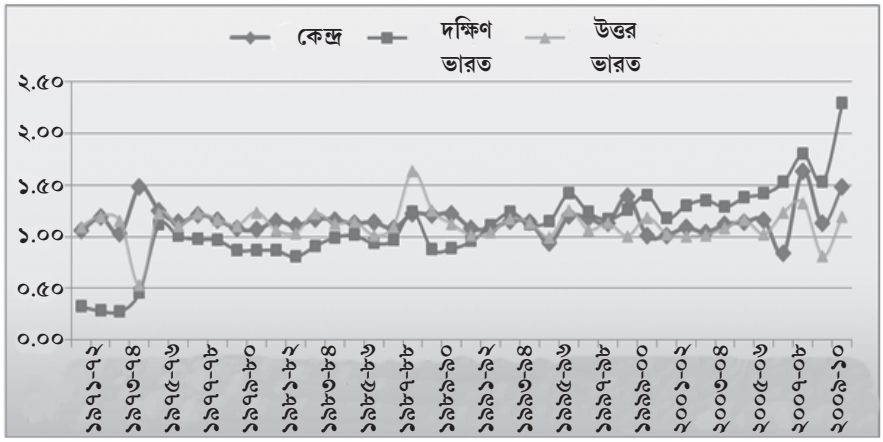

সূত্র : ক্যাগ [রেড্ডি, ২০১৪ থেকে]।

এবং বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখেন না। কেন্দ্রীকৃত কৃষি গবেষণা ব্যবস্থার জন্য বাড়তি তহবিল বরাদ্দ নিয়ে তাঁদের যত মাতামাতি।

পরিশেষে প্রশ্ন ওঠে, কৃষি উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, অপুষ্টি, পরিবেশ অবক্ষয় ইত্যাদি সমস্যার জন্য কৃষি গবেষণা বা কোনও বিশেষ প্রযুক্তির ওপর দোষারোপ করা কি যুক্তিযুক্ত (জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, ২০০৭, যোজনা কমিশন, ২০০৮)। বিস্তর ঝড়ঝাপটা সামলে টিকে থাকার জন্য কুর্নিশ জানাতে হয় কেন্দ্রীকৃত গবেষণা ব্যবস্থাকে। সরকারের জোগান চালিত মতবাদের জন্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন চালিয়ে যেতে পারাটা নীতিপ্রণেতাদের বাহবা দেওয়া উচিত। আমাদের সংসদ সদস্য, যোজনা কমিশন ও রাজ্য যোজনা পর্ষৎ কৃষি গবেষণায় কীভাবে সহায়সম্পদ ব্যয় হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ ও রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের টাকাকড়ি একমাত্র সেচ-রাসায়নিক সার ও কীটনাশক নির্ভর উৎপাদন গবেষণায় ঢেলে খালাস। কেন্দ্রীকরণ সবচেয়ে বড় গাঁট। একে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় না করা অবধি আরও ফান্ড জুগিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। স্থানিক দিক থেকে উপযোগী জ্ঞান সৃজন ও তার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে কৃষি গবেষণায় বিকেন্দ্রীকরণ ও তাতে রাজ্য সরকারের স্বত্বস্বামিত্ব থাকা জরুরি।❑

[ড. রায়না নয়া দিল্লির NISTADS (CSIR)-এ প্রধান বিজ্ঞানী।
email : rajeswari_raina@yahoo.com]

সেকেলে আইনের উভয় সংকটে অনাবাসী ভারতীয় সমাজ

প্রবাদ বলে পরিবর্তনই এই দুনিয়ায় একমাত্র চিরস্থায়ী। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পালটে নিতে হয় পুরোনো ধ্যানধারণা। কোনও একটি বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যে আইন প্রণীত হয় পরিবর্তিত সময়ে দাবি মেনে তাকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও সেই পুরোনো, ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইনগুলি রয়ে গেছে। এই আইনগুলি প্রতিনিয়ত সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করছে। নাগরিকত্ব বা বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনগুলির ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য। একদিকে যখন দেশে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের আয়োজন করে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য এদেশের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে কিছু সেকেলে ঔপনিবেশিক আইন এখনও বজায় রেখে যে কোনও সময় কোনও 'বিদেশি'-কে বহিষ্কারের জন্য রাষ্ট্রকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কেন এই অসংগতি? দেশের নাগরিকত্ব বা বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে পুরোনো আইনগুলিতেই কী বলা হয়েছে আর কী করলে সমাধানের পথ পাওয়া যাবে—আলোচনা করেছেন **অনিল মালহোত্রা।**

আগামী ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধীর দেশে ফেরার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। এই ঘটনাকেই স্মরণীয় করে রাখতে ওই বছরের ৯ জানুয়ারি আহমেদাবাদে উদ্‌যাপিত হবে 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস'। ওই দিন বিশ্বের সমস্ত অনাবাসী ভারতীয়কে তাঁদের মাতৃভূমিতে স্বাগত জানানো হবে। কিছু দিন আগেই নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্টেডিয়ামে বিপুল জনতার সামনে তাঁর ভাষণে আবেগদৃপ্ত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসমাজের জন্য ভারতের দরজা খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি বা পিআইও কার্ডধারীরা যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সারা জীবনের জন্য এদেশের ভিসা পেতে পারেন সেজন্য পিআইও এবং অনাবাসী ভারতীয় নাগরিক (ওসিআই) প্রকল্প দুটিকে মিশিয়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। এরপরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যে পিআইও কার্ড সারা জীবনের জন্য বৈধ থাকবে এবং এই কার্ডধারীদের পুলিশের কাছে রিপোর্টিং এবং বিদেশিদের আঞ্চলিক নিবন্ধীকরণ কার্যালয়ে নিবন্ধীকরণের নিয়ম থেকে ছাড় দেওয়া হবে। খুবই ভালো উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন এই আহ্বান শুনে জনসমাগম হবে তখন কী হবে? আমরা এই আহ্বানকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু একবারও কি তলিয়ে দেখেছি অনাবাসী ভাইবোনেরা যখন দেশে ফিরবেন তখন আমরা তাদের কী দিতে পারব? বিশেষ করে যে ভারতীয় আইনের দ্বারা তাদের দেশের বাড়ির পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে তারা কতটুকু সুবিধা পাবেন? আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের ফলে দ্রুত বদলে যাওয়া এই প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে যে এই দেশীয় আইনগুলি সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ করতে পারবে কি না। কারণ অনাবাসী ভারতীয়রা যদি আবার তাঁদের শিকড়ে ফিরে বসবাস করতে চান তাহলে প্রথমেই তাঁরা আইন সংক্রান্ত বিষয়ে এই প্রত্যাশা নিয়েই আসবেন। তাই প্রথমেই আমাদের দেশের আইনগুলি কতটা সময়োপযোগী তার একটা মূল্যায়ন করতে হবে।

অনাবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশে ২,১৯,০৯,৮৭৫ অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) বসতি গড়ে তুলেছে, ক্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের প্রকৃত সংখ্যাটা ৩ কোটির কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক ভারতীয়রা নিজেরাই একটি জাতি। তাই বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের নানান দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনের ভীষণভাবে প্রয়োজন। ভারতে এবং বিদেশে বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে তাদের সংযোগ বা যোগাযোগ বজায় রাখার সঙ্গে যে অবশ্যম্ভাবীভাবে অভিবাসন, জাতীয়তা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বাবা বা মা যে কোনও একজনের হেফাজতে শিশুকে হস্তান্তর, স্বামী/স্ত্রীর ভরণপোষণ, বৈবাহিক সম্পত্তির ভাগাভাগি, অন্য কোনও দেশের শিশুকে দত্তক গ্রহণ, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ, ভারতীয় সম্পত্তির স্বত্ব এবং অবশ্যই গর্ভ ভাড়া দেওয়া-নেওয়া বা সারোগেসি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি এসে পড়ে। সময়োপযোগী এবং সংশোধিত ভারতীয় আইনের অভাবে এই সমস্ত ব্যাপারে নানান সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিদেশি আদালত ও বিদেশের আইনজীবীরাও আতান্তরে পড়েন এবং সেজন্য তাঁরা এই নতুন যুগের নতুন সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে আইনের নতুন করে ব্যাখ্যা দাবি করেন। এদেশে বিদেশি আইন

কতটা প্রযোজ্য বা বিদেশে দেওয়া রায় এখানে কতটা বৈধ কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয় আদালতের রায়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন এসব বিষয়ে নতুন করে বিচার বিশ্লেষণ ও বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন।

অনাবাসী ভারতীয়দের বিদেশি জাতীয়তা বা নাগরিকত্ব সত্ত্বেও বিশ্বের যে সমস্ত প্রান্তে ভারতীয়রা ছড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিগত আইনগুলি (পার্সোনাল ল) প্রায় পাঁচ দশক পুরোনো। এগুলি একেবারেই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এই আইনগুলিকে সময়োপযোগী ও সংশোধনের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে বদলে যাওয়া সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইনগুলি তার উপযোগিতা হারিয়েছে এবং এগুলি আজকের আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ। তার ওপর এক্তিয়ার নিয়ে দ্বন্দ্ব সমস্যাকে আরও জটিল এবং চিরস্থায়ী করে তোলে। জটিলতার আবর্তে সমাধানের পথ না পেয়ে ভেঙে যায় অনেক পরিবার। এই সমস্যার শেষ কোথায়?

প্রেক্ষাপট

'পাসপোর্ট' এমন একটি নথি যেটি তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যগত দিক থেকে একজন ব্যক্তিকে একটি দেশের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং সেই ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার দেওয়ার জন্য অন্যান্য দেশের কাছে আর্জি পেশ করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ঘোষণার ভিত্তিতে সরকারি প্রাধিকারপ্রাপ্ত সংস্থাগুলি যে তাদের দেশের নাগরিকত্ব দিচ্ছে তারই স্বীকৃতিপত্র এই পাসপোর্ট। তাই ভারতীয় জাতীয়তা যাচাই করার পরই কোনও ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তবে কিছু বিশেষ শর্তে এবং প্রয়োজনীয় আইনি পন্থা মেনে ১৯৬৭ সালের 'পাসপোর্ট আইন'-এর আওতায় এই পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত, প্রত্যাহার এবং বাতিল করা যায়। সতয়ন্ত সিং সাহনি বনাম এপিও, নয়াদিল্লি অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার ১৯৬৭ সুপ্রিম কোর্ট ১৮৩৬, মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে পাসপোর্টের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মানে সংবিধানের ২১নং ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। আবার মানেকা গান্ধী বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন, অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার ১৯৭৮ সুপ্রিম কোর্ট ৫৯৭ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট পুনরায় স্পষ্ট করে দেয় যে পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করার কোনও আদেশ যেন মৌলিক অধিকারসমূহের পরিপন্থী না হয়।

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু

ব্রিটিশ আমলে তৈরি আইন-কানুন এখন আঁকড়ে ধরে রাখা হবে কেন সে নিয়ে যখন বিতর্ক চলছে তখন একটা কথা মনে রাখা দরকার যে গ্রেট ব্রিটেনও কিন্তু ১৮৪৯ থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে প্রণীত ৩৮টি আইন প্রত্যাহার করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই আইনগুলি ব্রিটিশ জমানায় ভারতীয় রেল নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত। আমরা কিন্তু এখনও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করছি না। যদিও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি সেকেলে, মান্ধাতা আমলের আইনগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেছে। ঘরদোরের ধুলো সাফ করার মতোই এই অচল আইনগুলিকে একেবারে ছেঁটে ফেলা উচিত। এই সব আইন বিভিন্ন দপ্তরের ফাইলে, দেরাজে মাকড়শার জালের মতোই বাড়তে থাকে। যুগের পরিবর্তনের আলো-হাওয়া এদের ওপর পড়ে না। সংসদ ১৯৬৭ সালে প্রণয়ন করেছে 'পাসপোর্ট আইন'। ১৯৫৫ সালে প্রণীত হয়েছে 'নাগরিকত্ব আইন'। ২০০৫ সালে এসেছে 'প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক' (ওভারসিজ সিটিজেনস অব ইন্ডিয়া)-এর ধারণা। কিন্তু এখনও আমরা বিভিন্ন কাজের জন্য সেই ১৯৩৯ সালের বিদেশি নিবন্ধীকরণ আইন (রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট ১৯৩৯), ১৯২০ সালের 'পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন' এবং ১৯৪৬ সালের 'বিদেশি আইন' (ফরেনার্স অ্যাক্ট)-এর ওপরই নির্ভর করি। ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত এই সমস্ত আইনের বেশিরভাগ আজ অনাবশ্যক এবং স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের বিরোধী। এই আইনগুলি রাষ্ট্রের হাতে এক অপ্রতিহত, স্বেচ্ছাচারী এবং দমনমূলক ক্ষমতা তুলে দেয়। অবিলম্বে এই আইনগুলিকে প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।

একটি অনুকূল আইন

পাসপোর্ট প্রদান এবং যাতায়াতের নথি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালের 'পাসপোর্ট আইন' একটি সর্বাত্মক এবং অনুকূল আইন। এই আইনে কোনও বিচ্যুতির জন্য বিধিবদ্ধ সুরক্ষার ব্যবস্থাসহ পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত ও প্রত্যাহারের কথাও রয়েছে। সেই সঙ্গে এই আইনের আওতায় অপরাধের জন্য ধার্য শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল জানানোর অধিকারও অভিযুক্তকে দেওয়া হয়েছে। তবে একই সঙ্গে 'পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন, ১৯২০' এবং 'বিদেশি আইন, ১৯৪৬' চালু থাকায় যথাবিহিত আইনি পদ্ধতি না মেনেই যে কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও সময় ভারত থেকে ফেরত পাঠানো বা বহিষ্কারের অপ্রতিহত ক্ষমতা রাষ্ট্রের রয়েছে।

ভারতের যে গণতান্ত্রিক দেশে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে সে দেশের আইনের অনুশাসনের আদর্শের পক্ষে এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত অবমাননাকর। ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের আইনে গৃহবন্দি করা, আটক করা, নির্জন কারাবাস, ভারত থেকে যে কোনও মুহূর্তে বহিষ্কারের বিধান ভারতীয় সংবিধানের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকেই লঙ্ঘন করে। এই কারণেই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এই আইনগুলিকে জারি রাখাই নিরর্থক এবং তা মৌলিক স্বাধীনতাই লঙ্ঘন করে।

নাগরিকত্বের বিধিবদ্ধ আইন

ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ ও নির্ধারণের যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হয় ১৯৫৫ সালের 'নাগরিকত্ব আইন' অনুযায়ী (সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট, ১৯৫৫)। এই আইনের ৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতের কোনও নাগরিক যদি স্বেচ্ছায় অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তিনি আর এ দেশের নাগরিক থাকবেন না। অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণের কারণে ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হওয়ার বিষয়ে নাগরিকত্ব আইনের ৯নং ধারাটি এক পূর্ণাঙ্গ বিধি। নাগরিকত্ব আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে এই আইনের উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার

প্রণয়ন করেছে নাগরিকত্ব বিধি, ২০০৯। এই নাগরিকত্ব বিধি, ২০০৯-এর ৪০নং বিধির আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কোনও নাগরিক কখন, কীভাবে এবং আদৌ অন্য কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে কি না এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে। এবং এই কাজ করার সময় সরকারকে বিধিসমূহের ৩নং তপশিলে বর্ণিত কার্যাবলির নিয়ম মেনে চলতে হয়। নাগরিকত্ব বিধির ৩নং তপশিলে নিম্নোক্ত মুখ্য বিষয়গুলি বিবেচনার কথা রয়েছে—

১. কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যদি মনে হয় যে এ দেশের কোনও নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তাহলে তিনি যে স্বেচ্ছায় ওই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেননি তা প্রমাণের জন্য ওই ব্যক্তির কাছে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে পারে সরকার। এতে স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন কি না তা প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপরই বর্তাবে।

২. কোনও ভারতীয় নাগরিক অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ওই প্রশ্ন বা আনুষঙ্গিক কোনও প্রসঙ্গে প্রয়োজন মনে হলে ওই রাষ্ট্রে নিজস্ব দূতাবাস বা ওই দেশের সরকারের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে এবং এই সূত্রে প্রাপ্ত কোনও তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৩. কোনও একটি তারিখে ভারতের কোনও নাগরিক অন্য কোনও দেশের সরকারের কাছ থেকে পাসপোর্ট পেলে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে যে তিনি ওই তারিখের আগে ওই দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন।

সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত আইন

যে ব্যক্তি আগে ভারতের নাগরিক ছিলেন পরে স্বেচ্ছায় অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করায় এ দেশের নাগরিকত্ব হারিয়েছেন কি না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ১৯৫৫ সালে 'নাগরিকত্ব আইন'-এর ৯(২) ধারা এবং ১৯৫৬ সালের 'নাগরিকত্ব বিধি'-র ৩০ নং বিধির আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, উপরোক্ত ৯(২) ধারা এবং ৩০নং বিধিতে বলা হয়েছে যে উক্ত আইনের ৯(২) ধারার আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত, শুধু বিদেশি পাসপোর্ট নিয়েছেন শুধু এই যুক্তি দেখিয়েই কোনও ব্যক্তিকে দেশ থেকে বহিষ্কার বা শাস্তির নির্দেশ দেওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে, উক্ত আইনের ৯(২) ধারার আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে যে বিচারের কথা বলা হয়েছে তা আসলে আধাবিচারবিভাগীয় ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত মামলাগুলির রায়ে আইনের বক্তব্য যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে সুপ্রিম কোর্ট, যথা—

(i) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকার বনাম আব্দুল খাদের এআইআর ১৯৬১, সুপ্রিম কোর্ট, ১৪৬৭

(ii) অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সরকার বনাম সইদ মহম্মদ, এআইআর ১৯৬২, সুপ্রিম কোর্ট, ১৭৭৮

(iii) উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার বনাম রেহমতুল্লা এআইআর ১৯৭১, সুপ্রিম কোর্ট, ১৯৮২

এই ভাবেই নাগরিকত্ব নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নতুন শ্রেণি

১২০ কোটি ভারতীয় আর সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রায় ১৮০টি দেশে ছড়িয়ে থাকা ৩ কোটি অনাবাসী ভারতীয়দের কথা মাথায় রেখে সরকার 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়েছে। অথচ ভারতীয় সংবিধানের ৯নং অনুচ্ছেদ এবং ১৯৫৫ সালের 'নাগরিকত্ব আইন' ৯নং ধারায় 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' নিষিদ্ধ। এই কারণেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের কিছু সীমিত সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য 'ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি' (পার্সনস অব ইন্ডিয়ান অরিজিন, পিআইও), এবং 'প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক' (ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া, ওসিআই) নামক দুটি শ্রেণি তৈরি করা হয়েছে। এই পিআইও এবং ওসিআই-রা এখন থেকে ভিসা, নিবন্ধীকরণ, বিধিনিষেধ বা অন্য কোনও অনুমতি ছাড়াই এ দেশে বসবাসের অধিকার ও সীমিত অধিকার পাবেন। এছাড়া, সংবিধানের ৫নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে সমস্ত ব্যক্তি ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা এবং এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন বা যাঁদের পিতা-মাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা যাঁরা সংবিধান চালু হওয়ার আগে অন্ততপক্ষে এ দেশে বাস করেছেন তাঁরা ভারতের নাগরিক হবেন। তাই ভারতের এই আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এঁদের ভারতীয় নাগরিক ধরে নিয়ে তাঁদের এই সুযোগসুবিধাগুলি দেওয়া হচ্ছে।

নাগরিকত্ব নির্ধারণ

১৯৪৬ সালের আইনে নাগরিকত্ব নির্ধারণের প্রশ্নে তখনই সমস্যা দেখা দেয় যখন একজন বিদেশি ব্যক্তি একাধিক দেশের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পান, অথবা কোনও বিদেশি নাগরিককে কোন দেশের নাগরিক বলা হবে সে বিষয়ে কোনও ধন্দ থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যে দেশের যোগ সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ তাঁকে সেই দেশেরই নাগরিক বলে চিহ্নিত করা হয়। ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের আইনে একজন বিদেশি ব্যক্তির জাতীয়তার প্রশ্ন মীমাংসার কোনও সুযোগ না দিয়েই বা তার জাতীয়তা প্রমাণের কোনও বিধিবদ্ধ অধিকার না দিয়েই তাঁকে এ দেশ থেকে ফেরত পাঠানো বা বহিষ্কারের অনুমোদন রয়েছে।

এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি মীমাংসার জন্য কোনও ট্রাইব্যুনালও নেই। যাইহোক, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন এবং ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব বিধিসমূহে বলা হয়েছে যে কোনও ব্যক্তি কখন, কীভাবে এবং আদপে অন্য কোনও দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন কি না সে নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করবে। এই সমস্ত বিধানের ব্যাখ্যা করে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি আধা বিচারবিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সচেতনভাবে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর ভারতীয় নাগরিক নন ততক্ষণ ওই ব্যক্তিকে ভারত থেকে বহিষ্কার বা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া যাবে না। আবার কোনও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কোনও ব্যক্তি বিদেশি পাসপোর্ট গ্রহণ করলে তাঁকে বিদেশির তকমা দেওয়া যাবে না এবং তাঁর জাতীয়তা নির্ধারণ তাঁর মৌলিক অধিকারের মধ্যেই পড়বে। এবার আমাদের

সংসদকে জাতীয়তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে যুক্ত করতে হবে।

বিতর্কিত প্রশ্ন

বর্তমানের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের পিআইও বা ওসিআই-এর সম্মান দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা যদি নিজের মাতৃভূমিতে আবার ফিরে আসতে চান তাহলে ১৯২০ ও ১৯৪৬ সালের ঔপনিবেশিক আইনের দোহাই দিয়ে তাঁদের বিদেশি বলে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা এই ঔপনিবেশিক আমলের এই আইনগুলি মৌলিক স্বাধীনতাকেই লঙ্ঘন করে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনটিই সময়োপযোগী ও যথাযথ। তাহলে ১৯২০ ও ১৯৪৬ সালের সেই পুরোনো আইন এখনও জারি রাখার প্রয়োজনটা কী? ১৯৪৬ সালের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে বিদেশিদের আগমন নিয়ন্ত্রণ করতে যে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয়েছিল আজকের পরিস্থিতিতে তা বজায় রাখতে হবে কেন? এই গুরুতর বিষয়ে অবশ্যই সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

এ মুহূর্তে যা প্রয়োজন

জন্মসূত্রে বিদেশি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক মতবিরোধ বা বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের কারণে জাতীয়তা প্রশ্নে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের। আইনি ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত মঞ্চ বা কর্তৃপক্ষ গড়ে সমস্ত অভাব-অভিযোগ শোনা, তা নিরসনই হবে এ লক্ষ্যে কাঙ্ক্ষিত পদক্ষেপ। তাই কোনও বিদেশি শক্তির এক্তিয়ারে কোনও ব্যক্তিকে বহিষ্কার করা আসলে সেই বিদেশি শক্তির কাছে আত্মসমর্পণেরই শামিল। একটি সার্বভৌম, সমাজতন্ত্রী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত এ দেশের আদি বাসিন্দাদের প্রতি ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে জাতীয়তা সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতার সমাধানে সক্ষম। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রণীত আইনগুলি এই সমাধানের পথই দেখায়। আমাদের গতিশীল বিচারবিভাগ এই আইনগুলিকেই নতুন করে ব্যাখ্যা করে সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক স্বাধীনতাকে রক্ষা করেছেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের যে আইনগুলির সঙ্গে মৌলিক অধিকারে প্রতিনিয়ত সংঘাত বাধছে সেগুলিকে এবার সংবিধি গ্রন্থ (স্ট্যাটিডন্ট বুক) থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত।

এই সেকেলে আইনগুলিকে প্রত্যাহারের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা আন্তর্জাতিক ভারতীয়দের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের কথা এবার গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে আইন প্রণেতাদের। এক দেশে বাবা অন্য দেশে থাকা মায়ের বৈবাহিক বিরোধ শিশুর হেফাজত বা যাতায়াতের মতো বিষয় নিয়ে রীতিমতো চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন আছে। কারণ স্বামী-স্ত্রীর বিবাদে নিরীহ শিশুরাই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যক্তিগত বিবাদ মেটানোর ঘুঁটি হিসাবে তাদেরই ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ভারতে বাণিজ্যিকভাবে গর্ভ ভাড়া দেওয়া বা সারোগেসি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নিয়ামক আইন এবং এই আইন রূপায়ণের জন্য কার্যকর আইনি ব্যবস্থাপনারও অবিলম্বে প্রয়োজন। মানুষ পাচার ও বেআইনি অভিবাসন রুখতেও একটি কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োজন যাতে দালালরা অশুভ চক্রে নিরীহ ভারতীয়দের আর জড়িয়ে ফেলতে না পারে। আন্তর্জাতিক পারিবারিক আইনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দায়বদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রেখে স্বামী/স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং বৈবাহিক আইনগুলিকে পরিমার্জন করা দরকার। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিশুদের দত্তক গ্রহণের বিষয়টি একেবারে নতুন আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়া দরকার। এদেশে বরাবর বাণিজ্যিক আইনগুলির ওপরই যাবতীয় মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। পরিবার ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী আইনগুলি অবহেলিত থেকে গেছে। ফলে গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ে পরিবর্তন প্রায় কিছুই হয়নি। এবার চিন্তায় পরিবর্তন আসুক। বদলাক ভাবনা। আমাদের দেশের দরজা যদি বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য খুলে দিতে চাই তাই প্রথমে তাদের একটি স্থায়ী বাড়ি, সুখী পরিবার, বসবাসের জন্য সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে হবে। ভারতের আইন পরিবেশ, পরিবেশ থেকে চোখ বুজে থাকতে পারে না। বিদেশি আইনগুলির সঙ্গে এ দেশের আইনের মেলবন্ধন ঘটাতেই হবে।❑

[লেখক আইনজীবী।
Email : anilmalhotra1960@gmail.com]

নাগরিকত্ব ও বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন এক নজরে

- বিদেশি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯৩৯—এই আইনে ভারতে বিদেশি নাগরিকদের জন্য নিবন্ধীকরণের বিধান রয়েছে।
- বিদেশি নিবন্ধীকরণ বিধিসমূহ, ১৯৯২—১৯৩৯ সালের বিদেশি নিবন্ধীকরণ বিধির স্থলে জারি করা হয়—১৯৩৯ সালের আইনের আওতায় বিধিসমূহ প্রণীত হয়।
- বিদেশি আইন, ১৯৪৬ (ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬)—এই আইনে বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
- বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত নির্দেশনামা, ১৯৪৮ (ফরেনার্স অর্ডার, ১৯৪৮), ভারত ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য ১৯৪৬ সালের আইনের ৩ ধারার আওতায় এই নির্দেশনামা জারি করা হয়।
- বিদেশি নাগরিক (ট্রাইব্যুনালস) নির্দেশনামা, ১৯৬৪ [দ্য ফরেনার্স (ট্রাইব্যুনালস) অর্ডার, ১৯৬৪]—কোন ব্যক্তি বিদেশি তা নির্ধারণের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে ১৯৪৬ সালের আইনের ৩নং ধারার আওতায় এই নির্দেশনামা জারি করা হয়।
- পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন, ১৯২০—ভারতে প্রবেশের জন্য পাসপোর্টের প্রয়োজনীয়তা জানাতে এই আইন।
- পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) বিধিসমূহ—১৯২০ সালের আইনের আওতায় প্রণীত বিধিসমূহ।
- পাসপোর্ট আইন, ১৯৬৭—ভারত থেকে যাত্রার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট ও ভ্রমণ নথি প্রদান এই আইন মেনেই হয়।
- নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫—ভারতীয় নাগরিক গ্রহণ ও নির্ধারণ এই আইন অনুযায়ী হয়ে থাকে।
- নাগরিকত্ব বিধিসমূহ, ২০০৯—নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫-এর আওতায় এই বিধিসমূহ প্রণীত।

পাট ছাড়া গতি নেই

পাটের ব্যাগ পলিথিনের অন্যতম বিকল্প

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যুগে যুগে প্রযুক্তিরও বিবর্তন হয়েছে। কোনও যুগে পাথর, কোনও যুগে ধাতু, বিভিন্ন সময় মানুষ বিভিন্ন পদার্থের উপযোগিতা আবিষ্কার করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে বর্তমান যুগকে 'প্লাস্টিকের যুগ' বলে আখ্যা দিলেও ভুল হবে না। তবে প্লাস্টিকের আধিপত্যের অবসান ঘটানোর সময় হয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হবে কীভাবে? উত্তর দিচ্ছেন **ড. সিতাংশু সরকার।**

প্লাস্টিক বা পলিথিনের আবিষ্কার মানব সভ্যতার এক বিশেষ যুগের সূচনা করেছে সন্দেহ নেই। এই প্লাস্টিকের আবিষ্কারের মুহূর্তটা—মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির পথে এক অভাবনীয় পদক্ষেপ হলেও, সেই সময়ে তা অনুধাবন করা যায়নি যে মানুষের জন্য এই প্লাস্টিক বা পলিথিন হতে চলেছে এক শক্তিশালী শত্রু। এত দ্রুত এর ব্যবহার বাড়বে তা বোধহয় আবিষ্কারক নিজেও ভাবতে পারেননি। পলিথিনের সুবিধাগুলিই শুধু মানুষের চোখে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল—তাই এর এত বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা এবং দূষণ বেড়েছে—সেই সঙ্গে বেড়েছে পলিথিনের ব্যবহার। ক্রমশ মানুষ বুঝতে শুরু করে যে প্লাস্টিকের ব্যবহার পৃথিবীর পরিবেশের জন্য কতখানি ক্ষতিকারক হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক

প্লাস্টিকের কথা বলতে গেলে, একটু জেনে নেওয়া দরকার বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিকের নাম। সাধারণত যে যে ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার হয় সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল—

- কম ঘনত্বের পলিইথিলিন (LDPE),
- উচ্চ ঘনত্বের পলিইথিলিন (HDPE),
- পলি ভিনাইল ক্লোরাইড (PVC),
- পলিকার্বনেট পলিস্টাইরিন (PS),
- পলি ইউরেথেন (PU),
- পলি প্রপিলিন (PP),
- পলি ইথিলিন টেরাপথলিন (PET)।

প্লাস্টিকের জনপ্রিয়তা

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ গড়ে বছরে প্রায় ১৭ কিলোগ্রাম প্লাস্টিক ব্যবহার করে, তার তুলনায় ভারতে ব্যবহৃত হয় ৫ কিলোগ্রামের মতো। আমাদের দেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার বাড়ার জন্য অনেক কারণ আছে—সাধারণত প্লাস্টিক অন্য সমকাজে ব্যবহৃত পদার্থের থেকে দামে কম, বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিকের আমদানি, প্রচার মাধ্যমে ভুল পথে চালনাকারী যথেচ্ছ বিজ্ঞাপন, প্লাস্টিকের সঠিক পথে পুনর্ব্যবহার না হওয়া, ইত্যাদি বিশেষভাবে দায়ী। প্লাস্টিক ব্যবহারের বিপদ আজকের পৃথিবী অনুধাবন করতে পেরেছে। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও অশিক্ষা, দারিদ্র এবং উন্নতির আঞ্চলিক বৈষম্য চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এই মূল কারণগুলির সমাধান না হওয়া পর্যন্ত—পৃথিবীর অনেক সমস্যার মতো প্লাস্টিকের সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

প্লাস্টিকের বিকল্প কেন দরকার

আজকাল দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। এ ধরনের উন্নয়ন ব্যতিরেকে—মানব সভ্যতাকে হয়তো বেশি দিন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কী এই দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী উন্নয়নের অর্থ? কেনই বা এই ধারণার দরকার হল? মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে বেড়েছে পৃথিবীর সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের আপাত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে গিয়ে ভুলে গেছে প্রকৃতির চিরপরিচিত কিছু তত্ত্ব। এই আপাত অগ্রগতি, এই ক্ষণিকের উন্নয়ন কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীতে রেখে যেতে চলেছে এক ভয়ংকর পরিবেশ—যেখানে দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, অনিয়মিত প্রতিকূল আবহাওয়া, জীব বৈচিত্রের সম্পূর্ণ বিনাশ, রোগ ব্যাধি জর্জরিত ও ভঙ্গুর আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানব সমাজ। এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পেতে দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ফলদানকারী উন্নয়নের বিশেষ দরকার। এই ব্যবস্থার অর্থ হল—এমন এক অবস্থার সৃষ্টি যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি একে অপরের পরিপূরক হিসাবে সম্পদের সৃষ্টি ও ব্যবহার করবে, সব সময়ের জন্য এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে এবং সেই সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর দায়বদ্ধতা থাকবে। দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ফলদানকারী উন্নয়নের পথে প্লাস্টিকের অসংযত ব্যবহার বিশেষ বাধা।

পলিথিনের ব্যাগ ও তার সমস্যা

প্লাস্টিকের ব্যবহারের এক বড় অংশ হল প্লাস্টিকের ব্যাগ। এই ব্যাগ প্রায়শই একবার মাত্র ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়, এটি সঠিক পদ্ধতিতে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করা হয় না, মাটিতে মিশে দীর্ঘস্থায়ী দূষণের

সমস্যা তৈরি করে এবং পোড়ানো হলে বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে মিশে যায়। এই বিষাক্ত গ্যাসে ডাইঅক্সিন নামক এক মারাত্মক রাসায়নিক থাকে, যা কিনা কর্কট রোগ (ক্যানসার), হরমোনের অসাম্য ও মানুষের অন্যান্য রোগের কারণ। প্লাস্টিকের উপাদানে অনেক সময় সিসা ও ক্যাডমিয়ামের মতো বিষাক্ত ভারী ধাতু মিশে থাকে। প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে এগুলি ছাইয়ে পরিণত হয় এবং মাটি ও জলে মিশে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সিসা নার্ভের জন্য খুবই ক্ষতিকারক এবং শিশুদের বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয়। ক্যাডমিয়াম কিডনির জন্য ক্ষতিকারক। পারদের মতো পদার্থও প্লাস্টিক পোড়ানোর সময় বেরিয়ে বাতাসে মিশে যায়। তাই এই সব সমস্যার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় যতটা সম্ভব প্লাস্টিকের ব্যবহার কম করা, বিশেষত যেসব প্লাস্টিক একবার বা মাত্র কয়েকবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া হয়। ক্ষতিকর পলিথিনের ব্যাগের ব্যবহার কম করতে হলে প্রয়োজন বিকল্পের। বিজ্ঞান ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হিসাবে জৈব প্লাস্টিকের কথা ভেবেছে। যদিও মনে করা হয়েছে যে এই জৈব প্লাস্টিক—জীবাণুর দ্বারা ভেঙে মাটিতে মিশে যাবে—কিন্তু কার্যত তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। জৈব প্লাস্টিকের ব্যাপারে আরও একটি কথা জানা দরকার যে—এটি তৈরি হয় স্টার্চ বা ওই জাতীয় খাদ্য পদার্থ থেকে। খাদ্য জাতীয় পদার্থ জৈব প্লাস্টিকে পরিবর্তিত করলে তৃতীয় বিশ্বে এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত রাষ্ট্রে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, যার ফলে এক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আরও গভীরতর সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে—এই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পলিথিনের বিকল্প ও পাটের গুরুত্ব

তাহলে প্লাস্টিকের বিকল্প কী? অবশ্যই পাটের ব্যাগ—পলিথিনের বিকল্প বা তার থেকে অনেক ভালো কিছু বলে ভাবা যেতে পারে। পাটের ব্যাগ তৈরিতে যে পাটের আঁশ দরকার হয়—তা উৎপাদনের জন্য পাট চাষ করতে হয়। সরাসরি পাটের ব্যাগের আলোচনায় যাওয়ার আগে পাট চাষের দুয়েকটি জরুরি কথা স্মরণ করা ঠিক হবে বলে মনে করি। পৃথিবীতে যখন দূষণের মাত্রা বহু গুণ বেড়েছে, স্বাস্থ্যপ্রদ অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্রমাগত আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে—সেই অবস্থায় পাটজাত দ্রব্য ও পাট চাষ খুবই প্রাসঙ্গিক। এক বিঘা জমির পাট তার ১২০ দিনের জীবনকালে প্রায় ২০০৭ কিলোগ্রাম কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে বাতাস বিশুদ্ধ করে। সেই সঙ্গে প্রায় ১৪৭২ কিলোগ্রাম অক্সিজেন বাতাসে দিতে পারে। মাটিতে পাটের পাতা ও শিকড় মিশে মাটির উর্বরতা প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়—ফলে পরবর্তী ফসলের জন্য রাসায়নিক সারের নির্ভরশীলতা কমাতে সাহায্য করে।

পাটের ব্যাগের চাহিদা

এবার আসা যাক পাটের বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ—তাদের চাহিদার পরিমাণ নিরূপণের কথায়। সারা পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্য মোড়কজাত করার যোগ্য পাটের ব্যাগের চাহিদা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই খাদ্যদ্রব্য মোড়কজাত করার মতো পাটের ব্যাগের ব্যবহার প্রায় ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কোকো, কফি, চা, কলা, চিনি, চাল, আলু, বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও মশলার প্যাকেট তৈরির জন্য প্রায় ৫,২০০ কোটি পাটের ব্যাগের চাহিদা হতে পারে। বিশেষত পুরোপুরি জৈব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন কোকো, কফি, কলা, চিনি ও চায়ের মোড়কজাত করার জন্য এই ধরনের পাটের ব্যাগের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়বে। অবশ্য পাটের ব্যাগ তৈরির সময় পাটের সুতোতে পেট্রোলিয়ামজাত জেবিও তেলের (জুট ব্যাচিং অয়েল) ব্যবহার কিছুটা হলেও এই পাটের ব্যাগের রপ্তানির পথে অন্তরায়। আন্তর্জাতিক পাট পরিষদ—এক নির্ণায়ক মাত্রার আদেশে বলেছে যে—পাটের এই ধরনের ব্যাগে হাইড্রোকার্বনের মাত্রা ১২৫০ মিলিগ্রাম প্রতি

সারণি-১
ভারতে বিভিন্ন প্রকার পাটের চট উৎপাদন
(হাজার টন হিসাবে)

বছর	চট (১)	অন্যান্য চট জাতীয় (২)	বস্তা (৩)
২০০৮-০৯	১৬৩৩.৭	৮৪.০৬	১০৪৪.২৭
২০০৯-১০	১৩২৪.৭	৬৮.৩৫	৮৯৪.২৮
২০১০-১১	১৫৬৫.৭	৬২.৩৭	১০৪৮.৫৩
২০১১-১২	১৫৮২.৪	৫০.৫২	১১৩৯.৯১
২০১২-১৩	১৫৯১.৩	৪৬.৩৩	১১৯৮.১০

(১) পাতলা ও মোটা চট, কার্পেটের নীচে দেবার কাপড় ইত্যাদি; (২) ক্যানভাস, বোনা চট, মাদুর বুনন চট, ঠাসা বুনন চট, মাটি সংরক্ষণের চট ইত্যাদি; (৩) এ টুইল্‌স, বি টুইল্‌স এবং অন্যান্য।

সূত্র : মান্থলি সামারি অব জুট অ্যান্ড গানি স্টাটিস্টিক্স, সিরিয়াল নম্বর-৮২৫; ডিসেম্বর ২০১৩।

সারণি-২
ভারতে পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার
(হাজার টন হিসাবে)

বছর	চট	বস্তা	কার্পেটের নীচে দেবার কাপড়	অন্যান্য	মোট
২০০৯-১০	১৮৬.৬	৮৭৯.৮	১.২	১৪১.৯	১২০৫.৫
২০১০-১১	১৮২.৩	১০৩৪.৪	০.৯	১৩৩.৪	১৩৫১.৫
২০১১-১২	১৮৪.২	১০৯৭.৭	০.১	১১৭.৯	১৩৮১.৯
২০১২-১৩	১৬৭.০	১১১৮.৯	০.০	১১৪.৫	১৪০০.৪
গড়	১৭৯.০	১০২৮.২	০.৬	১২৬.৯	১৩৩৪.৮

সূত্র : মান্থলি সামারি অব জুট অ্যান্ড গানি স্টাটিস্টিক্স, সিরিয়াল নম্বর-৮২৫; ডিসেম্বর ২০১৩।

কেজিতে থাকতে পারে, তার বেশি হলে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই জেবিও তেলের পরিবর্তে ধানের তুষের তেল (রাইস ব্রান অয়েল) ও রেড়ির তেলের (ক্যাস্টর অয়েল) ব্যবহারের চেষ্টায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। দেখা গেছে যে ধানের তুষের তেল জেবিও-র মতোই কার্যকরী সেই সঙ্গে পুরোপুরি জৈব। যদিও রেড়ির তেলের ব্যবহারে এখানেও কিছু অসুবিধা আছে। জেবিও-র পরিবর্তে ধানের তুষের তেল ব্যবহারে পাটের ব্যাগ খাদ্যদ্রব্য মোড়কজাতকরার যোগ্যতা পাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এই ধানের ব্যাগের চাহিদা বাড়ছে। আগামী অর্থ বছরে (২০১৫-১৬) কফির জন্য ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ, কোকোর জন্য ৪৮ লক্ষ, চায়ের জন্য ৬৪ লক্ষ এবং চিনির জন্য ৩৩ লক্ষ এই ধরনের পাটের বস্তা বা ব্যাগের প্রয়োজন হবে।

ভারতে পাটের দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার

ভারতে, বিশেষ করে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে পাট উৎপাদন ভালো হয়। স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমানে পাটের উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। তা সত্ত্বেও পাট ব্যবহারের বৃদ্ধির পথে কৃত্রিম তন্তুর প্রতিযোগিতা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও ভারতে পাটের আঁশ থেকে পাটের বিভিন্ন প্রকার চট বা চট জাতীয় দ্রব্যই বেশি তৈরি হয় (সারণি-১)। পাটের চট বা চট জাতীয় দ্রব্যই পাটের ব্যাগ ও বস্তায় পরিণত হয়— যা পলিথিনের ব্যাগের বিকল্প। তবে আশার কথা ভারতে মোট যা পাটের বিভিন্ন প্রকার চট বা ওই জাতীয় জিনিস তৈরি হয় তার বেশিরভাগই দেশের অভ্যন্তরেই ব্যবহৃত হয় (সারণি-২)।

পাটের জিনিসের আমদানি-রপ্তানি

ভারত থেকে মোট তৈরি হওয়া পাটের চট এবং তার তৈরি দ্রব্য বিদেশে অনেকটাই রপ্তানির মাধ্যমে পাঠানো হয় (সারণি-৩)। ভারত থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩ থেকে সাড়ে ৩ কোটি পাট দিয়ে তৈরি বাজার করার ব্যাগ আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত উন্নত

সারণি-৩
ভারত থেকে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি

বছর	পাতলা চট		বস্তার চট		কার্পেটের নীচের কাপড়	পাট থেকে তৈরি বিবিধ অন্য জিনিস	
	কাপড়	ব্যাগ	কাপড়	ব্যাগ		মেঝে ঢাকার কাপড়	বাজার করার ব্যাগ (হাজার)
			(হাজার বর্গমিটার হিসাবে)				
২০০৭-০৮	১২৪০৭৭	২৫.৬	১২৫৯	৩৪.৬	১১৬	১৭৭৭২	২৯৮০০
২০০৮-০৯	৯৭২১২	২৪.৮	২৫৭০	৫৮.৮	৭১০	১০৫৭৫	৩৪৬৪৯
২০০৯-১০	৭০২০৫	১৫.০	১৭০৪	২৬.৯	৫০	৭৫৬১	২২৭৯৪
২০১০-১১	১৬৮৬৩০	৩৪.৬	৪৩৯৫	৪৬.১	৮৯	৮০৫১	৩০৮৫৪
২০১১-১২	২০৪৫০৪	৬৮.৭	৩৫৬৪	৭৬.৪	৬৩	৬২৯৫	৩৩৩৩১
২০১২-১৩	১১৭১৮৩	৬২.১	২০৬১	৭০.২	২৩	৭০৮৭	৩০৪৩৭

সূত্র : মান্থলি সামারি অব জুট অ্যান্ড গানি স্টাটিস্টিক্স, সিরিয়াল নম্বর-৮২৫; ডিসেম্বর ২০১৩।

সারণি-৪
ভারতে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আমদানি (বাংলাদেশ থেকে)

	কাচা পাট (হাজার টন)	পাটজাত দ্রব্য (হাজার টন)	মোট আমদানি মূল্য (কোটি আমেরিকান ডলার)	বাংলাদেশের মোট রপ্তানির শতাংশ
২০০৯-১০	৫৬.৬২	১০৯.৫৯	৭৬.৫১	১৬.১
২০১০-১১	১৪৭.৪৭	১০১.৯৩	১০৭.২২	২০.৪
২০১১-১২	১৫৫.৫২	১১৫.৬৭	৯৬.৪৩	১৮.২
২০১২-১৩	১৬৫.৪১	১৪৫.৪৮	১০২.৯৮	১৯.৬

সূত্র : মান্থলি সামারি অব জুট অ্যান্ড গানি স্টাটিস্টিক্স, সিরিয়াল নম্বর-৮২৫; ডিসেম্বর ২০১৩।

সারণি-৫
রবি মরশুমে ভারতীয় খাদ্য নিগম ও অন্য রাজ্য সরকার দ্বারা পাটের বস্তার সংগ্রহ ও ব্যবহার

(হাজার বেল হিসাবে)

বছর	খাদ্য নিগম	পাঞ্জাব	হরিয়ানা	উত্তরপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	ওড়িশা	অন্যান্য	মোট
২০০৯-১০	১৭০.২৩	২৩৩.৭৪	৯৪.৯০	১০৭.৩৮	৬৩.০৫	১১.২৫	০.৬১	৬৮১.১৬
২০১০-১১	৩৭.৫৪	২১১.৭৭	৮৩.৮৫	৭৩.৯৭	১৯.১১	১০১.৪৫	২৯.১২	৫৫৬.৮১
২০১১-১২	৯৩.৩৬	৩৬২.০৫	২১৫.০৯	৭৮.৯১	৫৯.১৫	০	১.৮৮	৮১০.৪৪
২০১২-১৩	১২০.৭২	১৬১.৭২	২৩৫.১৭	৩১৯.১৫	৩১৯.১৫	০	৪২.৩০	১০৪৭.৪১

সূত্র : মান্থলি সামারি অব জুট অ্যান্ড গানি স্টাটিস্টিক্স, সিরিয়াল নম্বর-৮২৫; ডিসেম্বর ২০১৩।

সারণি-৬
খরিফ মরশুমে ভারতীয় খাদ্য নিগম ও অন্য রাজ্য সরকার দ্বারা পাটের বস্তার সংগ্রহ ও ব্যবহার

(হাজার বেল হিসাবে)

বছর	খাদ্য নিগম	পাঞ্জাব	হরিয়ানা	উত্তরপ্রদেশ	ওড়িশা	ছত্তিশগড়	অন্যান্য	মোট
২০০৯-১০	৭৩.০৫	৬৪৬.৮৮	৯৪.১২	১২৩.১১	৩৮.৮৪	১৭৭.৩২	—	১১৫৩.৩৩
২০১০-১১	৭৫.৬৮	৬৯১.৬৫	১০০.৪৯	৯৯.০৬	১৪.৪০	১৭১.৭৩	—	১১৫৩.০১
২০১১-১২	৮৮.৮১	৭০২.২৬	৮০.৪৭	১৭.৪২	৪৬.৯০	২৪৪.৪০	৮৫.৩৬	১২৬৫.৬২
২০১২-১৩	৭৮.১৭	৭২৪.৬২	১০৫.০৭	১০৩.৩৬	৭৯.৯৭	২৯৪.৮৪	২৪৩.৪০*	১৬৩২.৪৩

সূত্র : মান্থলি সামারি অব জুট অ্যান্ড গানি স্টাটিস্টিক্স, সিরিয়াল নম্বর-৮২৫; ডিসেম্বর ২০১৩।

*অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড

সারণি-৭
পাটের ব্যাগ ও পলিথিনের ব্যাগের তুলনা

তুলনার বিষয়	পাটের ব্যাগ	পলিথিনের ব্যাগ
উপাদানের উৎস	পাটের আঁশ, উদ্ভিদ দেহ থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে পাওয়া যায়।	খনিজ পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ থেকে উৎপন্ন।
উৎপাদন পদ্ধতি	প্রথমে পাটের কাপড় বা চট পাটকলে এবং পরে ছোট কারখানায় বা কুটির শিল্পে পাটের ব্যাগ তৈরি হয়।	উৎপাদনের জন্য মাঝারি বা বড় মাপের কারখানা প্রয়োজন।
পুনঃপুন ব্যবহার	একাধিকবার ব্যবহার করা যায়।	সাধারণত একবার বা মাত্র কয়েকবার ব্যবহার করা যায়। সেই কারণে আজকের দিনে পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে প্রায় ১০ লক্ষ পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার হয়।
গঠন/ক্ষমতা	শক্ত হওয়ার জন্য বেশি ওজনের জিনিস বেশি সময়ের জন্য বহনক্ষম।	ভারী জিনিস বেশিক্ষণের জন্য বহন করা যায় না।
গ্রহণযোগ্যতা	প্রথমে কেনার জন্য অপেক্ষাকৃত দামে একটু বেশি হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে এখনও সমাদৃত হয়নি।	কম দাম হওয়ার জন্য সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়। অনুন্নত দেশ তো বটেই, এমনকী উন্নত দেশগুলিও প্রচুর পরিমাণে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করে। একজন অস্ট্রেলীয় নাগরিক বছরে গড়ে ৩২৬টি পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করে।
ব্যবহারের খরচ	ধরা যাক একটি ১০০ টাকা দামের পাটের ব্যাগ কমপক্ষে ১ বছর (৩৬৫ দিন) চলে—তবে দিন প্রতি খরচ মাত্র ২৭.৪০ পয়সা।	একটি ১ বা ২ টাকা মূল্যের পলিথিন ব্যাগ ১ বার বা ২ বার ব্যবহার করে ফেলে দিতে হয়; সেক্ষেত্রে দিন প্রতি খরচ ১-২ টাকা পড়ছে, যা কিনা পাটের ব্যাগের তুলনায় ৩.৬-৭.৩ গুণ বেশি।
ব্যবহারকালে ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য	পুরোপুরি প্রাকৃতিক আঁশ থেকে তৈরি হওয়ায় (এবং যদি ভেষজ বা জৈব রং ব্যবহার করা হয়) মোটেই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়।	পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ থেকে তৈরি হওয়ার জন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে বিভিন্নভাবে ক্ষতিকর।
বহনকারী দ্রব্যের উপর প্রভাব	কোনও ক্ষতিকর প্রভাব নেই।	বিশেষত খাদ্যদ্রব্য বহন করা হলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব।
ব্যাগের জীবনকাল শেষে বর্জন পদ্ধতি	সহজেই মাটির জীবাণু দ্বারা পচে মাটিতে মিশে যায়।	প্রাকৃতিক জীবাণু দ্বারা পচন সম্ভব নয়; মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় অথবা পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রকৃতিতে সহজে ক্ষয় হয় না, প্রাকৃতিক আলো ও তাপের দ্বারা ভাঙতে অনেক বছর লাগে।
বর্জনের পরে প্রকৃতির উপর প্রভাব	প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব নেই, বরং মাটিতে জীবাণু দ্বারা পচে মাটির কার্বন ও অন্যান্য খাদ্য মৌলের জোগান দিতে পারে।	ফেলে দেওয়া হলে মাটির উপরে বা উপরিতলের মাটির সঙ্গে থেকে মৃত্তিকা দূষণের কারণ হয়, এমনকী সমুদ্রের জলের উপরে এবং নীচে সমুদ্রপৃষ্ঠেও প্রচুর পরিমাণে পলিথিনের ব্যাগ জমে দূষণ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে সমুদ্র জল তলের উপরে ভেসে বেড়ানো ৯০ শতাংশ বর্জ্য এবং সমুদ্রতলে জমে থাকা ৬০-৮০ শতাংশ আবর্জনা প্লাস্টিকজাত। পোড়ানো হলে বিভিন্ন প্রকার অতি ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ বাতাসে মিশে বায়ু দূষণের কারণ হয়।
মানুষের বাসস্থান, লোকালয় ও জনজীবনে সরাসরি প্রভাব	মানুষের বাসস্থানের মাটিকে দূষিত করে না। অপেক্ষাকৃত ভারী হওয়ার জন্য সাধারণ বেগের হাওয়ায় ভেসে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না। ফলে সহজেই পচে মাটিতে মিশে যায়।	মানুষের বাসস্থানের চারদিকের মাটিতে মিশে মাটিকে ফুল, ফল বা সবজি বাগান করার অনুপযুক্ত করে ফেলে। ওজনে খুবই হালকা হওয়ার জন্য হাওয়ায় ভেসে অন্যত্র ময়লা করে এবং ক্রমে জলনিকাশি নালায় গিয়ে জমে। মানুষের বসবাসের এলাকায় বিশেষত ছোট এবং মাঝারি শহরে বর্জ্য পলিথিনের ব্যাগ জলনিকাশি নালা বা ড্রেনগুলির জল বহনের ক্ষমতা ভীষণভাবে কমিয়ে দেয়, ফলে শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। হঠাৎ একটু বেশি বৃষ্টি হলে অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ে।
বর্জনের পরে জীব জগতের উপর প্রভাব	কোনও ক্ষতিকারক প্রভাব নেই।	গবাদি পশুর পেটে বর্জ্যের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, পরে মৃত্যুর কারণ হচ্ছে। পলিথিনের ব্যাগ খেয়ে ফেলা জীবজন্তু মারা যাওয়ার পরে সেই মৃতদেহ প্রকৃতিতে মিশে যাবার পরেও ওই পলিথিন আবার প্রকৃতিতে ফিরে আসে এবং নতুন করে দূষণ চক্রে যোগ দেয়। অন্য পশু, পাখি, মাছ এমনকী সামুদ্রিক প্রাণীও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমুদ্রের বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির কচ্ছপ পলিথিনের ব্যাগকে জেলিফিস মনে করে খেয়ে ফেলে এবং পরে মারা যায়।
সাধারণভাবে মানব সমাজের উপর অর্থনৈতিক প্রভাব	পাটের আঁশ ও পাটের ব্যাগের কাঁচামাল প্রান্তিক/ক্ষুদ্র চাষিরা এবং কুটির শিল্পের শ্রমিক উৎপন্ন করে। তাই পাটের ব্যাগের প্রসারে দেশের নিম্নতম স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক লাভ হবে।	সাধারণ মাঝারি বা বড় মাপের শিল্পের উৎপাদন। তাই পলিথিন ব্যাগ উৎপাদনে সাধারণ মানুষের সরাসরি অর্থনৈতিক লাভ নেই।

দেশগুলি পাটের উপযোগিতা বুঝতে পেরেছে এবং পলিথিনের অনিষ্টকর দিকের কথা বিবেচনা করে পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়িয়ে চলেছে।

ভারতের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে কিছু অতিরিক্ত প্রাকৃতিক সুবিধা থাকার জন্য উন্নত মানের পাটের আঁশ তৈরি হয়। তাই বাংলাদেশ থেকে কিছু উন্নত মানের কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য প্রতি বছর ভারত আমদানি করে, যার মূল্য গড়ে প্রায় ৯৬ কোটি মার্কিন ডলার (সারণি-৪)।

ভারতে পাটের বস্তার অভ্যন্তরীণ ব্যবহার

ভারত খাদ্যশস্যে স্বনির্ভর হওয়াতে খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে পাটের বস্তার প্রয়োজন হয়। দেশের অভ্যন্তরে এই পাটের ব্যাগের সবচেয়ে বেশি চাহিদা যে যে রাজ্যগুলিতে তা হল—পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা (সারণি-৫ এবং সারণি-৬)। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা—ভারতীয় খাদ্য নিগম, খাদ্যশস্য গুদামজাত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পাটের ব্যাগের ব্যবহার করে। এতদিন আইনের মাধ্যমে সরকারি অনুগ্রহে খাদ্যশস্য, চিনি ইত্যাদি মজুত করার জন্য পাটের বস্তার ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা ছিল। ক্রমে তা কেন্দ্রীয় আইনের মাধ্যমে শিথিল করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ পলিথিনের মোটা ব্যাগ পাটের বস্তার পরিবর্তে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। সরকারি এবং বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই পলিথিনের বস্তার ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া অনুচিত বলেই মনে হয়। এতে পলিথিনের বা প্লাস্টিকের অনিষ্টকর দিকগুলি আরও প্রকট হয়ে দেখা দেবে এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে পলিথিনের দূষণ অনুতাপের বিষয় হবে।

পাট ও পলিথিনের তুলনা

পাটের ব্যাগ ও প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরির জন্য শক্তির প্রয়োজনেরও বিশেষ তারতম্য আছে। এক কিলোগ্রাম পলিহাইড্রক্সি অ্যালকালয়েড-এর (এক ধরনের প্লাস্টিক) তুলনায় সম পরিমাণ পাটের ব্যাগ তৈরিতে প্রায় ৮০ মেগাজুল শক্তি কম ব্যয় হয়—যা কিনা আজকের পরিস্থিতিতে খুবই প্রাসঙ্গিক এবং অবশ্য গ্রহণযোগ্য। পাটের ব্যাগের উৎপাদন পদ্ধতিতে এই শক্তির সাশ্রয়, জৈব প্লাস্টিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য—সেখানেও পাটের ব্যাগ তৈরির তুলনায় অনেক বেশি শক্তি ব্যয়িত হয়। বর্তমান প্রযুক্তিতে প্রতি কিলোগ্রাম পাটের চট তৈরিতে মাত্র ২ মেগাজুল শক্তির প্রয়োজন হয়—যা কিনা অন্য প্লাস্টিক বা জৈব প্লাস্টিকের তুলনায় অনেক গুণ কম। অম্লতাকরণের ক্ষেত্রেও প্লাস্টিক ও জৈব প্লাস্টিক পাটের ব্যাগের তুলনায় অনেক ক্ষতিকারক। এক কিলোগ্রাম জৈব প্লাস্টিকের অম্লতাকরণের ক্ষমতা এক কিলোগ্রাম সালফার ডাইঅক্সাইডের ১.০৯ শতাংশ। সেই তুলনায় পাটের ব্যাগের অম্লতাকরণের মাত্রা নগণ্য। ব্যবহারের শেষে প্লাস্টিক বা জৈব প্লাস্টিকের আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যার আছে, তুলনায় পাটজাত ব্যাগের এ ধরনের কোনও সমস্যা নেই—প্রকৃতিতে সহজেই মিশে যায় এবং কোনও দূষণের কারণ হয় না।

সারণি-৭-এ এই তুলনামূলক আলোচনায় পাটের ব্যাগ ও পলিথিনের ব্যাগের ভালো-মন্দ গুণাগুণ বিচার করা হল। এই আলোচনা থেকেই পাঠক বিচার করবেন পাটের ব্যাগ, পলিথিনের ব্যাগের আদর্শ বিকল্প কি না।

সমাধানের পথে

পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি এবং অন্যান্য সকল স্তরে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। কিছুদিন আগেই ফিলিপিন্সের ম্যানিলা শহরে ভয়ংকর বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়—যার কারণ হিসাবে প্লাস্টিকের ব্যাগকেই দায়ী করা হয়েছে। সে দেশের সরকার দ্রুত এর প্রতিকারের চেষ্টা করেছে এবং ম্যানিলা শহরে প্লাস্টিক, জৈব প্লাস্টিক ও ফোমজাত প্যাকেটের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই নিষেধ কার্যকরী করার জন্য সব ধরনের প্রয়াস করেছে। গত বছরের (২০১৩) মাঝামাঝি সময়ে আমাদের দেশের রাঁচি জেলার প্রশাসন পলিথিনের ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। এধরনের প্রচেষ্টা সর্বত্র হওয়া দরকার। তবে আইনত এই পলিথিনের ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টাই যথেষ্ট হবে না—প্রকৃত পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন সাধারণ মানুষের মধ্যে প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হবে ও প্লাস্টিকের বিকল্প হিসাবে পাটজাত বা ওই ধরনের পরিবেশ সহায়ক জিনিসকে গ্রহণ করার প্রকৃত আগ্রহ তৈরি হবে। এক সুন্দর সবুজ পৃথিবীর মাতৃক্রোড়ে মানবজাতির ক্রমবিকাশ প্রকৃতিকে গ্রহণ করে, প্রকৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে চলতে পারলেই সম্ভবপর হবে।❑

[লেখক ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় পাট ও সহজাত তন্তু গবেষণা সংস্থায় প্রধান বিজ্ঞানী (শস্য বিজ্ঞান)। Email: sarkaragro@gmail.com]

উন্নয়নের রূপরেখা

'জীবন প্রমাণ' : পেনশন গ্রহীতাদের জন্য চালু হল ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট

এক কোটিরও বেশি পেনশন গ্রহীতাদের জন্য সম্প্রতি চালু হল আধারভিত্তিক ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট 'জীবন প্রমাণ'। এর ফলে প্রতি বছর নভেম্বর মাসে ব্যাংকে সশরীরে হাজির থেকে লাইফ সার্টিফিকেট দাখিল করার যে ব্যবস্থা এতদিন চালু ছিল তা এখন থেকে আর আবশ্যিক থাকছে না। প্রয়োজনে ঘরে বসেও 'জীবন প্রমাণ' দাখিল করে পেনশন গ্রহীতারা এখন তাদের পেনশন অ্যাকাউন্ট চালু রাখতে পারবেন। বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে পেনশন গ্রহীতার নির্দিষ্ট আধার সংখ্যাসহ বায়োমেট্রিক তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য এক বিশেষ সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেছে কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর। পেনশন গ্রহীতার কম্পিউটার বা মোবাইল ফোন মারফত এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও নথিভুক্ত করা যাবে। পেনশন গ্রহীতার যাবতীয় তথ্য, এমনকী দিনক্ষণসহ সমস্ত ধরনের বায়োমেট্রিক তথ্য সংরক্ষিত থাকবে কেন্দ্রীয় স্তরে। তা থেকে পেনশন প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট পেনশন গ্রহীতার লাইফ সার্টিফিকেট দেখে বা খুঁজে নিতে পারবে প্রতি বছর। আর এ থেকেই প্রমাণিত হবে যে সংশ্লিষ্ট পেনশন গ্রহীতা ওই সময় জীবিত রয়েছেন।

এর আগে যে ব্যবস্থা এতদিন চালু ছিল (বা এখনও রয়েছে) তার আওতায় পেনশন গ্রহীতাকে ব্যক্তিগতভাবে পেনশন প্রদানকারী সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থিত থেকে বা সেন্ট্রাল পেনশন অ্যাকাউন্টিং অফিস (CPAO) নির্দিষ্ট ফর্মে লাইফ সার্টিফিকেট দাখিল করতে হত।

বর্তমানে পঞ্চাশ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশন গ্রহীতা রয়েছেন। প্রায় সমানসংখ্যক মানুষ পেনশন পেয়ে থাকেন বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের কাছ থেকে। বেশ কিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতেও চালু রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য পেনশনের সুযোগসুবিধা। শুধুমাত্র ২৫ লক্ষেরও বেশি অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী পেনশন পেয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে। আধারভিত্তিক ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট পুরোপুরি চালু হয়ে গেলে বহুসংখ্যক প্রবীণ নাগরিক প্রতি বছর সশরীরে ও ব্যক্তিগতভাবে হাজির থেকে লাইফ সার্টিফিকেট দাখিল করার ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পাবেন।

'জীবন প্রমাণ' সংক্রান্ত সফটওয়্যারের সুযোগ গ্রহণের জন্য পেনশন গ্রহীতাদের অতিরিক্ত কোনও মূল্য দিতে হবে না। ব্যক্তিগত কম্পিউটার বা স্মার্টফোন থেকেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতির সুযোগ গ্রহণে খুব বেশি ব্যয় করতে হবে না। জাতীয় ই-গভর্ন্যান্স প্ল্যানের আওতায় যে সমস্ত সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র রয়েছে সেখানেও এই সুযোগসুবিধা মিলবে। সাধারণত দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকার পেনশন গ্রহীতাদের জন্য এ ধরনের পরিষেবা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।

'ভারতেই তৈরি করুন' কর্মসূচির আওতায় ১২টি বিশেষ প্রশিক্ষণ সংস্থা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২টি বিশেষ প্রশিক্ষণ সংস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব করেছে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ মহানির্দেশালয়। এজন্য মোট ব্যয় হবে ২০০ কোটি টাকা। চারু ও কারু শিল্পের প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এটি তার প্রথম পর্যায়। সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় বৃত্তিমূলক কাজে ৯২০০ জন প্রশিক্ষক গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য 'ভারতেই তৈরি করুন' বা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচির এটি একটি অংশবিশেষ যার মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষকের চাহিদা মেটাতে কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ মহানির্দেশালয়ের এ ধরনের মোট ২৭টি প্রশিক্ষণ সংস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ ধরনের সংস্থা স্থাপনের কাজে সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণের একটি মডেল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে মহানির্দেশালয়ের।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ মহানির্দেশালয় হল ভারতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনকারী সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

বাল স্বচ্ছতা মিশন

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে সূচনা হল বাল স্বচ্ছতা মিশনের। সারা দেশ জুড়ে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের যে কাজ শুরু হয়েছে এটি তারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। প্রধানমন্ত্রী 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর সূচনা করেন গত ২ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে। দেশ জুড়ে বাল স্বচ্ছতা মিশনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার থিম বা বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্র। যেমন—

(১) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। (২) খেলার মাঠসহ পরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। (৩) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও শিশু পরিচর্যার ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা। (৪) পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত খাদ্য। (৫) নির্মল ও দূষণমুক্ত পানীয় জল। (৬) পরিচ্ছন্ন শৌচাগার।

বিভিন্ন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, নগরোন্নয়ন দপ্তর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য দপ্তর এবং তথ্য ও প্রচার দপ্তরের সহযোগিতায় বাল স্বচ্ছতা অভিযানে উদ্যোগী হওয়ার।❑

ঘো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২১ অক্টোবর—২০ নভেম্বর, ২০১৪)

বহির্বিশ্ব

● **স্বাধীন প্যালেস্তাইনের পক্ষে ব্রিটেনের জনমত :**

সংবাদে প্রকাশ, সার্বভৌম প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সে একটি প্রতীকী ভোটের আয়োজন করা হয়। ভোটে ২৭২ জন সাংসদ স্বাধীন প্যালেস্তাইনের পক্ষে ভোট দেন। বিপক্ষে মাত্র ১২ জন। পুরো ব্যাপারটাই যদিও প্রতীকী, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে ব্রিটিশ জনপ্রতিনিধিদের বিপুল সমর্থনের বার্তা, যা ইজরায়েলকে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। প্রতীকী ভোটে রায়ের প্রেক্ষিতে যদিও ব্রিটিশ প্রশাসন ইজরায়েল সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তন করবে, এমন ইঙ্গিত দেয়নি। তবু ইজরায়েল উদ্বিগ্ন, কারণ তারা নিশ্চয়ই বোঝে যে, প্রতীক কখনও কখনও ওজনে ও গুরুত্বে বাস্তবকে ছাপিয়ে যায়। প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতার পক্ষে ক্রমবর্ধমান জনমত আজ না হোক কাল ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করবেই। কেননা গণতন্ত্রে জনমত দীর্ঘকাল উপেক্ষা করা যায় না। ইতিহাসেই তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

● **শ্রীলঙ্কায় নির্বাচন ঘোষণা :**

আগামী জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কায় সাধারণ নির্বাচন। প্রথমে বলা হয়েছিল, ২০১৬ সালের নভেম্বরে ভোট হবে। কিন্তু সে দেশের নির্বাচন কমিশন ভোট এগিয়ে আনার কথা জানিয়ে দেয়। সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি মাহিন্দা রাজাপক্ষেই নির্বাচন, ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে এগিয়ে আনার সুপারিশ করেন। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কার শেষ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ভোটে রাজাপক্ষের দল ইউনাইটেড পিপলস ফ্রিডম অ্যালায়েন্স (UPFA) বিপুলভাবে জয়ী হয়। সংসদের ২২৫টি আসনের মধ্যে তারা ১২৭টি আসন পায়। প্রধান বিরোধী ইউনাইটেড ফ্রন্ট পায় ৫৬টি আসন। আর তামিল বিদ্রোহী গোষ্ঠী এলটিটিই-পন্থী তামিল ন্যাশনাল অ্যাল্যায়েন্স ১৭টি আসনে জয়ী হয়। কিন্তু ২০১০-এর ওই নির্বাচনে শাসকদলের জয় আদৌ নিঃসংশয় ছিল না। ব্যাপক কারচুপি এবং সেনাবাহিনীর হুমকি-বলপ্রয়োগের অভিযোগ উঠেছিল। সেবারের নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অতি গোপন সূত্রে যতটুকু খবর ফাঁস হয়েছিল, তাতে ওই নির্বাচনকে আদৌ সুষ্ঠু বা অবাধ বলা হয়নি। এবারও রাজনৈতিক মহলে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **প্রয়াত জামাত নেতা গোলাম আজম :**

বাংলাদেশে জামাত-এ-ইসলামি সংগঠনের শীর্ষ নেতা গোলাম আজম (৯৩) প্রয়াত হলেন। ৯০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই জামাত নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে তিনি মুক্তিকামী মানুষের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত আজমকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দিয়েও পরে তা কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করে।

● **রাশিয়ায় এক ঘণ্টা পিছিয়ে গেল সময় :**

গত ২৬ অক্টোবর রাশিয়ায় ঘড়ি ধরে এক ঘণ্টা পিছিয়ে গেল সময়। অর্থাৎ তিন বছর আগের জারি করা ৯ টাইম জোন থেকে ১১ টাইম জোনের পুরনো পদ্ধতিতেই ফিরলেন রুশ নাগরিকেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে রাশিয়ায় একটি টাইম জোন মেনে সময় নির্ধারণ সম্ভব হয় না। শীতকালে দেশের উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দিনের সময়সীমা দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় কমে যায় অনেকটাই। এ জন্য ১৯৮১ সালে, রাশিয়ায় (তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন) চালু হয় 'ডে লাইট সেভিং টাইম'। এই পদ্ধতিতে গরমকালে রুশদের ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে নিয়ে যেতে হত। ২০১১ সালে এখনকার প্রধানমন্ত্রী দিমিত্রি মেদভেদেভ ১১ টাইম জোন কমিয়ে ৯ টাইম জোনের প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিতে সারা দেশে একটাই সময়, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন সময় মেনে চলার ব্যবস্থা করা হয়। শীতকালে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা উঠে যায়। কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন রুশরা। সময়ের সঙ্গে খামখেয়ালি আচরণ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে খারাপ প্রভাব ফেলছে, এই অভিযোগ ওঠে। প্রতিবাদের মুখে রুশ কর্তৃপক্ষ ফের আগের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

● **ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি পদে পুনর্নির্বাচিত দিলমা রুসেফ :**

দু'দফায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ওয়াকার্স পার্টির দিলমা রুসেফ দ্বিতীয় বারের জন্য ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। অনেক আশা জাগিয়েও রুসেফের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এসিও নেভেস অল্প ব্যবধানে হেরে যান। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে রুসেফ পান ৫২ শতাংশ ভোট। আর নেভিস পান ৪৮ শতাংশ।

প্রথম দফার কোনও প্রার্থী ৫০ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় ব্রাজিলের সংবিধান অনুযায়ী দ্বিতীয় দফার ভোট হয়। নির্বাচনের আগে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ব্রাজিলে আর্থিক মন্দা, বেকারি ও দিলমা সরকারের দুর্নীতি-স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দেয়। তার ওপর গত জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ

ফুটবলের আয়োজন করে আক্ষরিক অর্থেই জনসাধারণের রোষের মুখে পড়ে। নাগরিকের কর্মসংস্থান, খাদ্য সুরক্ষা ইত্যাদি যখন সংকটে, তখন বিপুল ব্যয়বহুল বিশ্বকাপ ফুটবল কেন? ব্রাজিলের বড় অংশের মানুষ এই প্রশ্ন তোলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দিলমা রুসেফ জয়ী হয়েছেন। তাঁর সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ।

● **নাৎসি বন্দিদের চর হিসাবে ব্যবহার :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ স্থানীয় একাধিক সংবাদ সংস্থা সূত্রে প্রকাশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রায় এক হাজার নাৎসি বন্দিকে গুপ্তচর হিসাবে কাজে লাগিয়েছে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ। আর এই কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। গোপন নথির ভিত্তিতে সংবাদ সংস্থাগুলি বলেছে, একদা হিটলার অনুগামী ওই সকল বন্দিদের 'ঠান্ডা যুদ্ধের' দিনগুলিতে সে সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নজরদারি রাখার কাজে (গুপ্তচর) ব্যবহার করা হয়।

● **তিউনিসিয়ায় পালাবদল :**

প্রাক্-নির্বাচনী জনমত সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, তিউনিসিয়ায় ক্ষমতাসীন 'এন নাহাদ পার্টি' জয়ী হবে খুবই অল্প ব্যবধানে। কিন্তু ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় যে বিরোধী নিদা তিউনিস পার্টি, জাতীয় সংসদের ২১৭টি আসনের মধ্যে ৮৩টি পেয়ে একক গরিষ্ঠ হয়েছে। 'এন নাহাদ' ৬৮টি। ফ্রি পেট্রিয়টিক ইউনিয়ন ও পপুলার ফ্রন্ট পেয়েছে যথাক্রমে ১৭ ও ১২টি আসন। এই দুটি দল নিদা তিউনিস পার্টিকে সমর্থন করায় সরকার গঠনে সমস্যা হয়নি।

২০১০ সালে 'অ্যারাব স্প্রিং' (সরকার বিরোধী বিদ্রোহ) সূচনা হয়েছিল যে দেশে, সে তিউনিসিয়া-য় এমন রক্তপাতহীন পালাবদল শান্তিকামী বিশ্বকে আশ্বস্ত করেছে যে, গণতন্ত্র এখনও সজীব।

● **ফের মাথা তুলে দাঁড়াল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র :**

ধ্বংসের স্মৃতি নিয়েই ১৩ বছর পরে মার্কিন জনতার জন্য খুলে দেওয়া হল নবনির্মিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র। মার্কিনবাসী ফিরে পেলেন তাঁদের গর্বের ইমারত, তাঁদের সমৃদ্ধির এই প্রতীক। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর (৯/১১ বা নাইন-ইলেভেন হিসাবে অভিহিত) আল-কায়দা জঙ্গিবাহিনীর বিমান সন্ত্রাসে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের যমজ মিনার। নজিরবিহীন ওই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ২,৭৫৩ জন মানুষ। সেই জায়গাতেই ফের মাথা তুলল নবনির্মিত গগনচুম্বি বাণিজ্য কেন্দ্র।

● **কঠিন সাজা দক্ষিণ কোরিয়ার ডুবে যাওয়া জাহাজের ক্যাপ্টেনের :**

দীর্ঘ সাত মাস পরে সাজা ঘোষণা করা হল দক্ষিণ কোরিয়ার ডুবে যাওয়া ফেরি নৌকার ক্যাপ্টেন লি জুন সিউকের। সোলের এক আদালত তাঁকে ৩৬ বছরের কারাদণ্ড দেয়। রায়ে বলা হয়, ডুবন্ত যাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টা না করে ক্যাপ্টেন তাঁর সহযোগীদেরকে নিয়ে পালিয়ে যান। এটা গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধের কোনও মাফ নেই। প্রসঙ্গত, গত ১৬ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সোলের কাছের ইনচিওন বন্দর থেকে জেজু বন্দর যাওয়ার পথে ৪৭৬ জন যাত্রী-সহ 'সিউল' নামের ফেরি ডুবে যায়। প্রথমে মৃতের সংখ্যা ৩০০ বলা হলেও পরে দেখা যায় যে, মাত্র ৭০ জন যাত্রী প্রাণে বেঁচেছেন। হঠাৎ মৃতের সংখ্যা চার শতাধিক। দুর্ঘটনায় এত মানুষের দায় স্বীকার করে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী চুং হং-ওন পদত্যাগ করে বিশ্ব রাজনীতিতে বিরল দৃষ্টান্ত রাখেন।

● **জনপ্রিয় অধ্যাপক খুন রাজশাহি-তে :**

রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই আততায়ীর আক্রমণে নিহত হলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এ কে এম সফিউল ইসলাম (৪৮)। অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা ও জীবনধারণের জন্য সুপরিচিত ছিলেন এই অধ্যাপক। ছাত্রছাত্রীমহলেও খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ছাত্রীদের বোরখা ছাড়াই নির্ভয়ে চলাফেরায় অনুপ্রাণিত করতেন। এই কারণেই ইসলামি মৌলবাদীদের রোষের মুখে পড়েন। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়ে যান। 'আনসার আল ইসলাম বাংলাদেশ' নামে একটি মৌলবাদী সংগঠন এই হত্যার দায় স্বীকার করেছে।

● **আইএস জঙ্গিদের নৃশংসতা অব্যাহত :**

সিরিয়ার ইসলামিক স্টেট জঙ্গিরা আরও একজন মার্কিন পণবন্দির শিরচ্ছেদ করে তাদের ওয়েবসাইটে সেই ছবি প্রকাশ করল। এবার তাদের শিকার মার্কিন ত্রাণকর্মী পিটার কাসিগ। ২০১২ সালে জঙ্গিরা তাঁকে পণবন্দি করে। এই নিয়ে মোট পাঁচ মার্কিন নাগরিকের মুণ্ডচ্ছেদের ছবি ভিডিও পোস্ট করল জঙ্গিরা। গত ২০ আগস্ট মার্কিন সাংবাদিক জেমস ফোলির শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। এদিকে সিরিয়ার মানবাধিকার সংগঠন 'অবজারভার'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, আইএস জঙ্গি মামলায় গত জুলাই (২০১৪) থেকে এ পর্যন্ত বহু বিদেশি-সহ প্রায় ১৫০০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

এই দেশ

● **হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে নতুন মুখ্যমন্ত্রী :**

বিজেপি-র মনোহরলাল খট্টর হরিয়ানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হলেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হলেন ওই রাজ্যের বিজেপি সভাপতি দেবেন্দ্র ফড়নবীশ। মহারাষ্ট্রে তিনিই প্রথম বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী। এর আগে, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা ও বিজেপি জোট সরকার হলেও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শিবসেনার নেতা। ৩১ অক্টোবর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন দেবেন্দ্র ফড়নবীশ।

● **বন্যাবিধ্বস্ত উপত্যকার পুনর্গঠনে কেন্দ্রীয় সাহায্য :**

জম্মু-কাশ্মীরের ৬টি প্রধান হাসপাতালের সংস্কারের জন্য ১৭৫ কোটি টাকা এবং বন্যায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িগুলির পুনর্নির্মাণের জন্য ৫৭০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২৩ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীর সফরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সাহায্যের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত ওই রাজ্যের পুনর্গঠনে ৪৪ হাজার কোটি টাকা সাহায্য দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

● **সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প উত্তরপ্রদেশে :**

রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থা এনএইচপিসি (ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন) উত্তরপ্রদেশে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ হাতে নিয়েছে। এই লক্ষ্যে তারা উত্তরপ্রদেশের নিউ অ্যান্ড রিনিউএবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (UPNEDA)-র সঙ্গে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

চুক্তি অনুযায়ী, দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এবং নজরদারিতে প্রকল্পটি গড়ে তোলা হবে। তবে এক্ষেত্রে UPNEDA-এর ভূমিকা প্রকল্পটিকে 'প্রমোট' (promote) করা। বিদ্যুৎ সংস্থার সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে তা হল 'প্রমোটার্স এগ্রিমেন্ট'। প্রকল্পটি গড়ে উঠছে উত্তরপ্রদেশের পরসন অঞ্চলে। নির্মীয়মাণ প্রকল্পটি থেকে ৫০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

● **ঝাড়খণ্ড ও জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা :**

বন্যাবিধ্বস্ত জম্মু-কাশ্মীর ও মাওবাদী প্রভাবিত ঝাড়খণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। দুটি রাজ্যেই ২৫ নভেম্বর থেকে মোট পাঁচ দফায় ভোট নেওয়া শুরু হচ্ছে। ২ ডিসেম্বর দ্বিতীয় দফা। তৃতীয় দফা ৯ ডিসেম্বর। ১৪ ডিসেম্বর চতুর্থ দফা। পঞ্চম তথা শেষ দফা ২০ ডিসেম্বর। ভোট গণনা ২৩ ডিসেম্বর।

জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় মোট আসন ৮৭। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডের আসন সংখ্যা ৮১। দুটি রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা যথাক্রমে ৭২ লক্ষ ২৫ হাজার ও ২ কোটি ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার।

● **কালো টাকা উদ্ধার সংক্রান্ত কিছু তথ্য :**

বিদেশি ব্যাংকে লুকিয়ে রাখা কালো (অবৈধ) টাকা উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে এনে তা দেশবাসীকে ভাগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি নামের তালিকা প্রকাশ করে। বলা হয় যে, এই তিন জনের বিদেশি ব্যাংকে কালো টাকা জমা আছে। এর পর সুপ্রিম কোর্টের কঠোর নির্দেশ মেনে ২৯ অক্টোবর ৬২৭ জনের নামের একটি তালিকা মুখবন্ধ খামে জমা দেয়। এরা সকলেই বিদেশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মালিক। কিন্তু নানা আইনি জটিলতায় ওই নাম আপাতত গোপন রাখা হবে।

● **মন্ত্রীসভার রদবদল ও সম্প্রসারণ :**

৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বড়সড় রদবদল ঘটানো হল। একই সঙ্গে চার পূর্ণমন্ত্রী-সহ ১৭ জন প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রদবদলের তালিকায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের নাম দেওয়া হয়েছে। রেল, প্রতিরক্ষা, আইন, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীদের হয় অন্য মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে, নয়তো একজনের হাতে থাকা একাধিক মন্ত্রক ছাঁটকাট করা হয়েছে। অন্যদিকে ওই চার মন্ত্রকে চারজন নতুন পূর্ণমন্ত্রী-সহ আরও ১৭ জন প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নাম, মনোহর পারিকর (পূর্ণমন্ত্রী), সুরেশ প্রভু (পূর্ণমন্ত্রী), বাবুল সুপ্রিয় (প্রতিমন্ত্রী), রাজবর্ধন রাঠোর (প্রতিমন্ত্রী), মুখতার আব্বাস নকভি (প্রতিমন্ত্রী)। সব মিলিয়ে মন্ত্রীসভার সদস্য সংখ্যা দাঁড়াল ৬৬। শুরুতে ছিল ৪৫ জন।

● **ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় যাবজ্জীবন :**

চার বছর আগে ২০১০ সালে জম্মু-কাশ্মীরের মাচিল সেক্টরে তিন তরুণকে 'জঙ্গি' সাজিয়ে সংঘর্ষের নামে হত্যার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত এক মেজর ও ৬ জওয়ানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল সেনা আদালত। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১০ সালের ৩০ এপ্রিল সেনাবাহিনী ঘোষণা করেছিল যে, মাচিল সেক্টরে তারা তিন 'পাকিস্তানি জঙ্গি'-কে হত্যা করে অনুপ্রবেশ রুখেছে। কিন্তু তদন্তে দেখা যায় যে নিহত ওই তিন জনই কাশ্মীর উপত্যকার বারামুল্লা জেলার বাসিন্দা এবং নিতান্ত নিরীহ। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক হইচই পড়ে যায়। হত্যার মামলা শুরু হয়। সাড়ে চার বছর পরে দোষীরা শাস্তি পায়।

● **ফিরে এল কিষাণ বিকাশ পত্র :**

২০১১ সালে তুলে নেওয়া 'কিষাণ বিকাশ পত্র' ফের চালু হল। ১৮ নভেম্বর থেকে বাজারে ছাড়া হল ১০০০, ৫০০০, ১০০০০ এবং ৫০০০০ টাকার সার্টিফিকেট। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে দেশের লোকসাধারণকে উৎসাহ দিতে, সারদার মতো বেসরকারি আর্থিক সংস্থায় টাকা রেখে প্রতারিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে এই সঞ্চয় যোজনা ফিরিয়ে আনা হল বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, 'কিষাণ বিকাশ পত্র'-এর মাধ্যমে আট বছর চার মাস বা ১০০ মাসে টাকা দ্বিগুণ করতে পারবেন বিনিয়োগকারী।

● **চাকরির পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা কমানো হল :**

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির জন্য 'ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন'-এর (UPSC) পরীক্ষার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা এবং পরীক্ষায় বসার মেয়াদ কমিয়ে দিল সরকার। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, সাধারণ পড়ুয়াদের জন্য পরীক্ষায় বসার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩০ থেকে ২৬ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৩ থেকে ২৮ বছর এবং তফশিলি জাতি-উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৩৫ থেকে কমিয়ে ২৯ বছর করা হল। অন্য দিকে সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, সাধারণ পরীক্ষার্থীরা এবার থেকে মাত্র তিন বার, ওবিসি পাঁচ বার এবং তফশিলি জাতি-উপজাতিরা ছয় বার পরীক্ষায় বসতে পারবেন।

● **প্রধানমন্ত্রীর ১০ দিনের ত্রি-দেশীয় সফর :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ থেকে ১৯ নভেম্বর বিদেশ সফর সেরে এলেন। ১২ নভেম্বর মায়ানমারের নে পি দ্য-য় দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সংগঠন 'আসিয়ান' শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেন। ১৩ নভেম্বর ওই একই জায়গায় নবম পূর্ব এশিয়া বৈঠকে যোগ দেন। এরপর ১৪ নভেম্বর তিনি যান অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে।

১৫ ও ১৬ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী জি-২০ (বিশ্বের ২০টি উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সংগঠন) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন। এরপর ১৭ নভেম্বর সিডনি-র অলফোনস অ্যারেনা-র প্রেক্ষাগৃহে অনাবাসী ভারতীয়দের সমাবেশে ভাষণ দেন। ১৮ নভেম্বর ক্যানবেরায়

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবটের সঙ্গে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য বৃদ্ধির ওপর জোর দেন। ওই দিনই তিনি মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার শিল্প মালিকদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান। এর পর নরেন্দ্র মোদী মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের বিদায়ী নৈশভোজে যোগ দেন। ২০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে আসেন।

● **মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মৎস্যজীবীদের নিঃশর্ত মুক্তি :**

পাঁচ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় মৎস্যজীবী-কে নিঃশর্তে মুক্তি দিল শ্রীলঙ্কার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট)। তাঁরা ১৯ নভেম্বর জাফনার কারাগার থেকে মুক্তি পান। ২০ নভেম্বর দেশে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, 'মাদক পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই পাঁচ মৎস্যজীবীকে ২০১১ সালে ৩০ নভেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। কলম্বো উচ্চ আদালতে বিচার চলে। প্রায় চার বছরের মাথায় ২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর আদালত মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায়। এর প্রতিবাদে তামিলনাড়ুতে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ওই বিষয়ে হস্তক্ষেপে বাধ্য হয়। কলম্বো উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ভারত ১১ নভেম্বর শ্রীলঙ্কার শীর্ষ আদালতে আবেদন জানায়। অবশেষে মুক্তি।

এই রাজ্য

● **রাজ্যে তৃতীয় সমুদ্র বন্দরের পরিকল্পনা ঘোষণা :**

সাগরদ্বীপে একটি গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। কলকাতা এবং হলদিয়ার পর এটি হবে এ রাজ্যের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর। বিনিয়োগের পরিমাণ ১২ হাজার কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার বন্দর তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র দিয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।

● **রাজ্যে পঞ্চায়েতে বিকল্প আয় বৃদ্ধির উদ্যোগ :**

এক তরফা সরকারি অনুদান বা খয়রাতি দিয়ে পঞ্চায়েতের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি আর টানা সম্ভব নয়। কীভাবে নানা পরিষেবার বিনিময়ে আয় বাড়ানো যায়, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। সন্ধান চলছে বিকল্প আয়ের উৎসের। এই লক্ষ্যে রাজ্য জুড়ে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় একটি সার্বিক সমীক্ষা শুরু হয়েছে। সমীক্ষায় পঞ্চায়েতের আয়ের কাঠামো খতিয়ে দেখা ছাড়াও পাইপবাহিত পানীয় জলের সরবরাহ, বিপণন কেন্দ্র তৈরি বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে দোকান লিজ দেওয়ার মতো কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আয় বাড়ানোর সুযোগ যাচাই করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানানো হয়েছে।

● **রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কর্তা বদল :**

মেয়াদ ফুরোনোর আগেই, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান বিনয়কান্তি দত্ত সরে দাঁড়ালেন। বিনয়কান্তি-র জায়গায় পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে এলেন বিশিষ্ট নদী-বিশেষজ্ঞ ডক্টর কল্যাণ রুদ্র।

● **আন্তর্জাতিক পুরস্কার দার্জিলিং চিড়িয়াখানার :**

বন্যপ্রাণীদের কৃত্রিম প্রজননে অসাধারণ সাফল্যের জন্য 'আর্থ হিরোজ' পুরস্কার পেল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান ন্যাশনাল জুলজিক্যাল পার্ক। রয়্যাল ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড এবং ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া এই আন্তর্জাতিক পুরস্কার এই প্রথম কোনও ভারতীয় চিড়িয়াখানার ঝুলিতে জমা পড়ল। পুরস্কারদাতা কমিটিকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয় বর্মন বলেন, রাজ্য সরকার যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, এই পুরস্কার তারই স্বীকৃতি। বাস্তবিক পক্ষে, ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত দার্জিলিং চিড়িয়াখানা পাহাড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরল প্রজাতির প্রাণীদের কৃত্রিম প্রজননে অত্যন্ত জোর দিয়েছে। গত কয়েক দশকে এই চিড়িয়াখানায় ৪০টি তুষার চিতা, ৩৮টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে। এছাড়াও জন্ম হয়েছে তিব্বতি নেকড়ে ও স্যালামন্ডারের। কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে এ এক অসাধারণ সাফল্য বলে আন্তর্জাতিক মহলে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **'কেএলও' নিষিদ্ধ :**

'সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত', এই অভিযোগে নিষিদ্ধ করা হল কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-কে। ১৯৬৭ সালের 'বেআইনি কার্যকলাপ রোধ আইন' প্রয়োগ করে কেএলও-কে 'নিষিদ্ধ সংগঠন' বলে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। উত্তরবঙ্গের ৬টি ও অসমের ১৪টি জেলা নিয়ে স্বাধীন কামতাপুর রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৩ সালে গোষ্ঠীটির জন্ম। কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা তাদের ঘোষিত লক্ষ্য।

● **রাজ্যে সড়ক নির্মাণে আরও কেন্দ্রীয় বরাদ্দ :**

রাজ্যে 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা'-র কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। তাই আরও ৮৩১ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হল। আর এই কাজে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা।

● **বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত রায়গঞ্জ কলেজ :**

উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ (ইউনিভার্সিটি) কলেজ-কে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ বিষয়ক বিধেয়ক (বিল) ১১ নভেম্বর রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হল। তবে এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

● **আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস :**

রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অর্থানুকূল্যে নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের পথচলা শুরু হল। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর এই ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। তিন বছরেরও কিছু কম সময়ের মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হল। প্রসঙ্গত, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৪ বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। ১৭৮০ সালে 'মহামেডান কলেজ অফ ক্যালকাটা' বা 'মাদ্রাসাই আলিয়া' নামে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত রাজ্য ও দেশের শিক্ষায় বড় ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

● **শিশু অধিকার রক্ষায় নতুন নির্দেশালয় :**

শিশু অধিকার ও শিশু পাচার বিষয়ে নতুন নির্দেশালয় বা 'ডিরেক্টরেট' তৈরির সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্য সরকার। রাজ্যের নারী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রকের অধীনে এতদিন একটি মাত্র 'ডিরেক্টরেট' ছিল। সেটি ভেঙে নতুনভাবে তিনটি দপ্তর তৈরি হচ্ছে। অঙ্গনওয়াড়ি নিয়ে তৈরি হচ্ছে একটি, শিশু অধিকার ও শিশু পাচার বিষয়ে তৈরি আর একটি। এছাড়াও সমাজকল্যাণ বিষয়ে থাকছে একটি ডিরেক্টরেট। এর জন্য ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে এবং ১৫৬টি নতুন পদও সৃষ্টি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে।

● **স্কুলে ওবিসি সংরক্ষণে সিদ্ধান্ত :**

রাজ্যের সরকারি স্কুলের পাশাপাশি এবার সরকার অনুমোদিত এবং পোষিত স্কুলগুলিতেও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য ভর্তিতে সংরক্ষণ চালু করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ১৮ নভেম্বর জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যে সব স্কুলে শিক্ষকদের বেতন-সহ আর্থিক দায় সরকার বহন করে সেগুলিতে ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করতে হবে। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই সংরক্ষণ চালু করতে হবে।

● **বিশ্ব ব্যাংক-এর পুরস্কার রাজ্য পঞ্চায়েতকে :**

রাজ্যের ৯৮৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করল বিশ্ব ব্যাংক। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, ভালো কাজের জন্য বিশ্ব ব্যাংক রাজ্যের মোট ৯৮৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ২০ লক্ষ টাকা পুরস্কার তুলে দিয়েছে। রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরিষেবা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ননের ভিত্তিতে 'ভালো' পঞ্চায়েত বাছাই করে বিশ্ব ব্যাংক। দু-বছর ধরে রাজ্যের ৯৯৯টি পঞ্চায়েতের কাজের ওপরে নজরদারি চালিয়ে তারা ৯৮৬টি বেছে নিয়েছে। আর ওই পুরস্কারের টাকা শুধু পঞ্চায়েতের কাজেই খরচ করা যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র এমন পুরস্কার পেল। এটা নিঃসন্দেহে নজিরবিহীন।

অর্থনীতি

● **কয়লা নিয়ে অধ্যাদেশ :**

শীর্ষ আদালতে বাতিল হওয়া ২১৪টি কয়লাখনি অধিগ্রহণ করতে অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) জারি করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান, এই কয়লা ব্লকগুলি অধিগ্রহণের পর নিলামে তোলা হবে। অনলাইন নিলাম বা ই-অকশনের মাধ্যমে বেসরকারি কয়লা, বিদ্যুৎ এবং সিমেন্ট সংস্থাকে কয়লাখনিগুলির বরাত দেওয়া হবে।

● **স্পট এক্সচেঞ্জ মিশবে মূল সংস্থায় :**

৫৬০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়া ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (NSEL)-কে তার মূল সংস্থা, ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি অফ ইন্ডিয়া (FTIL)-র সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ব্রোকার, লগ্নিকারী, ঋণদাতা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই যাতে টাকা ফেরত পায়, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত বলে জানায় কেন্দ্রীয় কোম্পানি বিষয়ক মন্ত্রক।

● **জলপথ পরিবহণে তহবিল :**

পরিবেশবান্ধব ও সস্তায় পণ্যবহনে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'মার্কো পোলো' প্রকল্পের আদলে সুসংহত পণ্য পরিবহণের জন্য উৎসাহ দিতে একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতে ৭,৫১৭ কিলোমিটার উপকূলরেখা রয়েছে। অন্তর্দেশীয় পণ্য পরিবহণের জন্য মাত্র ১৫ শতাংশ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট উপকূলের ৪৩ শতাংশ ব্যবহার করা হয় স্থানীয় পণ্য পরিবহণের জন্য। ইউরোপ থেকে উৎসাহিত হয়ে, ভারত জলপথ পরিবহণের ক্ষেত্র বাড়াতে চায়।

● **পিএফ সুবিধা বিদেশি কর্মীদের :**

ভারতে কর্মরত বিদেশিরা এবার সরাসরি নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা হস্তান্তর করতে পারবেন বলে পিএফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিদেশি কর্মীদের পাওনা টাকা দ্রুত তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা দিতেই এই নতুন ব্যবস্থা বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **ব্যবসার কৌশল ঢেলে সাজাচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক :**

ব্যবসা-কৌশল ঢেলে সাজার অঙ্গ হিসাবে বিশ্ব জুড়ে ৫০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ব ব্যাংক। খারিজ করা হয়েছে ৭০টি পদের বিজ্ঞাপনও। তবে একই সঙ্গে ভারতে অন্তত ২৫০-৩০০ নতুন লোক নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে তারা (বিশ্ব ব্যাংক)।

● **'গ্লোবাল গ্রোথ কোম্পানি' হিসাবে বিশ্ব স্বীকৃতি :**

চলতি বছরের জন্য আর্থিক বৃদ্ধি ও সম্ভাবনার মাপকাঠিতে বিশ্বের অগ্রণী সংস্থা বা 'গ্লোবাল গ্রোথ কোম্পানি' হিসাবে স্বীকৃতি পেল বন্ধন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস। ৫ নভেম্বর 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম'-এর মঞ্চে সংস্থার কর্ণধার চন্দ্রশেখর ঘোষের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। এ বছর 'বন্ধন'-এর পাশাপাশি, এই সম্মান পেয়েছে ফ্লিপকার্ট, মেক মাই ট্রিপ, জাস্ট ডায়াল-সহ মোট ১৭টি সংস্থা।

● **খাদ্য সুরক্ষায় ভারতের দাবি মেনে নেওয়া হল :**

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে ভারতের দাবি মেনে নিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গণবণ্টনের জন্য শস্য মজুত করার ব্যবস্থা এবং ওই একই লক্ষ্যে দেওয়া খাদ্যে ভরতুকি বজায় রাখার ব্যাপারে ভারতের দাবির সঙ্গে একমত হল তারা। এজন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পুরনো প্রথা থেকে সরে এসে তা 'অনির্দিষ্টকাল' বহাল রাখায় সায় দিল মার্কিন প্রশাসন।

● **ওএনজিসি-র লগ্নি :**

পশ্চিম ভারতে গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস উত্তোলনের জন্য ১০,৬০০ কোটি টাকারও বেশি লগ্নি করার সিদ্ধান্ত নিল রাষ্ট্রায়ত্ত

সংস্থা ওএনজিসি (অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারল গ্যাস কর্পোরেশন)। এর মধ্যে মুম্বই হাই সাউথ তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য ৬,০৬৯ কোটি টাকা লগ্নি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংস্থা সূত্রে জানানো হয়। সেখানে ৩৬টি নতুন কূপ খননের কাজ শুরু হতে চলেছে।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **'ইবোলা' নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র সর্বশেষ প্রতিবেদন :**

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মুহূর্তে পশ্চিম আফ্রিকার তিন দেশ, গিনি, লাইবেরিয়া ও সিয়েরালিওন-এ 'ইবোলা' সংক্রমণে আক্রান্তের সংখ্যা শীঘ্রই ১০ হাজার ছাড়াতে চলেছে। পাশাপাশি এই মারণ সংক্রমণ প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতা চলছে 'ইবোলা'-র জন্য তৈরি প্রতিষেধক কানাডা থেকে ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে 'জেনিভা ইউনিভার্সিটি হসপিটালে'। এছাড়াও জার্মানি, গ্যাবন ও কেনিয়ায়ও প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা চলছে। এই পৃথক পৃথক গবেষণার ফলাফলের মধ্যে সমন্বয় করা হচ্ছে বলে 'হু'-র প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এই প্রতিষেধকগুলির মধ্যে অন্তত দুটি প্রতিষেধক বাঁদরের দেহে কাজ দিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের আশা, মানুষের দেহেও কাজ করবে এগুলি।

● **'ইনফ্লুয়েঞ্জা' প্রতিরোধে নতুন গবেষণা :**

মরশুম বদলের হাত ধরে 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' সংক্রমণ দাপিয়ে বেড়ায়। অসহায় বোধ করেন চিকিৎসকেরাও। এবার সেই অসহায়তা ঘোচাতে আশার আলো দেখিয়েছেন জুরিখের 'সুইস ফেডেরাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি'-র গবেষক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই গবেষক, ইঁদুরের শরীরে এবং গবেষণাগারে মানব ফুসফুস-এর কোষ 'কালচার' করে দেখেছেন, 'ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ' যখন তার আরএনএ (রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড)-কে কোষের মধ্যে চালান করে সংক্রমণ ছড়ায়, তখন তাকে সাহায্য করে মানব শরীরেরই পাঁচটি জিন। এই জিনগুলি হল, এইচ ড্যাক ৬, মায়োসিন ১০, ডাইনিন, মাইক্রোটিবিউল এবং অ্যাক্টিনিন। জিনগুলি যাতে আর এমন কাজ না করতে পারে, বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে তৈরি ওষুধের মাধ্যমে সেটা নিশ্চিত করেন গবেষক। তাঁর গবেষণাপত্র বিশ্বখ্যাত 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

● **পেরুতে আদিম মানব আস্তানার সন্ধান :**

দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুর আন্দিজ পর্বতমালায় মানুষের এক আদিম আশ্রয়স্থলের সন্ধান পেলেন মার্কিন নৃতত্ত্ববিদের একটি দল। তাঁদের মতে, আজ থেকে ১৫ হাজার বছর আগে অর্থাৎ শেষ তুষার যুগে পেরুর এই পুকুঞ্চো অঞ্চলেই আস্তানা গেড়েছিল মানুষ। এটাই ছিল সেই সময়ের সমুদ্রতল থেকে সর্বোচ্চ উচ্চতার আশ্রয়স্থল। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে ওই জায়গা থেকে পাওয়া গেছে একাধিক গুহা, যার ছাদে রয়েছে মোটা ভুষো কালির স্তর। ওই গুহাগুলিতে পাওয়া গেছে আলু জাতীয় এক ধরনের উদ্ভিদ। পাওয়া গেছে বেশ কিছু হাড়গোড়ও। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, ওই আদিম মানবগোষ্ঠীরা ছিল মূলত শিকারি ও খাদ্য সংগ্রহক। সেই চরম প্রতিকূল আবহাওয়ার দিনগুলিতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি পাথুরে খাঁজই হয়ে উঠেছিল সেই আদিম মানুষের ছাদ। পাহাড়ি ঝরনা ছিল জলের উৎস। আর পাহাড়ে পাওয়া চকচকে ও ধারালো অবসিডিয়ান পাথরের টুকরো দিয়েই অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে নিত আদিম মানুষের সেই গোষ্ঠী।

● **মানব-জিনোম ম্যাপিং :**

মানুষের শরীরের পূর্ণ জিনোম-এর ম্যাপিং হয়েছিল অনেক আগেই। এবার ৪৫ হাজার বছর আগের মানব শরীরের জিনোম পুনর্গঠন করে এ বিষয়ে গবেষণায় নতুন তথ্যের হদিস দিলেন জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাংক ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখিয়েছেন, প্রায় ৬০ হাজার বছর আগে কীভাবে আফ্রিকা থেকে বর্তমান 'হোমো স্যাপিয়েন্স' মানুষের পূর্বসূরিরা এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের দাবি, নিয়ানডার্থাল-ম্যান ও বর্তমান মানুষের একই পূর্বসূরি। এতদিন বলা হত যে, ৩৭-৮৬ হাজার বছরের মধ্যে বর্তমান মানুষের সঙ্গে নিয়ানডার্থাল ম্যানের সংকরায়ণ ঘটেছিল। কিন্তু সর্বশেষ গবেষণায় এই সময়ের ব্যবধান কমিয়ে ৫০-৬০ হাজার বছর ধরা হয়েছে।

● **বিলুপ্ত পাখি :**

লন্ডনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের একটি দলের সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুযায়ী, গত তিরিশ বছরে ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অন্তত ৪২১ কোটি পাখি কার্যত বিলুপ্ত। তাদের আর দেখাই পাওয়া যায় না। বিরল প্রজাতি তো বটেই, এমনকী চড়াই ও শালিকের মতো অতি সাধারণ প্রজাতির পাখিও এই তালিকায় রয়েছে বলে সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, কৃষি ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং আগ্রাসী নগরায়ণের চাপ নিতে পারছে না পাখিরা। তাদের বসবাসযোগ্য গাছও বিরল হয়ে পড়েছে। সঙ্গে রয়েছে আলোর দূষণের মতো বিষয়ও। ফলে অস্তিত্ব সংকটে পাখিরা।

● **পার্কিনসন্স প্রতিরোধে দারচিনি :**

শিকাগোর রাশ ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টারের স্নায়ুবিদ্যার গবেষক কালীপদ পাহানের দাবি, দারচিনি গুঁড়ো পার্কিনসন্স রোগের অন্যতম দাওয়াই হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত নামী পত্রিকা 'জার্নাল অব নিউরো ইমিউন ফার্মাকোলজি'-তে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে গবেষক পাহান জানিয়েছেন, দারচিনির সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে ডোপামিন নিঃসরণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া গেছে। আর মস্তিষ্কের ওই ডোপামিন নিঃসরণকারী কোষগুলি মরে গেলেই পার্কিনসন্স-এ আক্রান্ত হন মানুষ। দারচিনি ওই কোষগুলিকেই ফের বাঁচিয়ে তোলে।

● **'কিউরিওসিটি'-র নতুন অনুসন্ধান :**

মার্কিন মহাকাশযান 'কিউরিওসিটি'-র সৌজন্যে মঙ্গলগ্রহে খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে সম্প্রতি এক বুলেটিনে সারা বিশ্বকে

জানিয়েছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র 'নাসা' (ন্যাশনাল অ্যারোনেটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। বলা হয়েছে, মঙ্গলগ্রহের মাউন্ট শার্পের কাছ থেকে প্রথম খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। মহাকাশযানের যান্ত্রিক হাত মঙ্গলগ্রহের 'কনফিডেন্স হিল' থেকে যে পাথরের গুঁড়ো সংগ্রহ করেছে, তা গবেষণাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেগুলি আসলে 'হেমাটাইট'। আর লোহার অন্যতম খনিজ এই হেমাটাইট। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এভাবে পাওয়া হেমাটাইটে লোহার পরিমাণ কতটা সেই শতাংশের পরিমাণ বার করা গেলে মঙ্গলগ্রহের অতীত ইতিহাস অনেকটাই স্পষ্ট হবে।

● **ধূমকেতুতে পা রাখল মহাকাশযান :**

এবার ধূমকেতুতেও পা রাখল মহাকাশযান। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ৬৪০ কোটি কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে 'রোসেটা' মহাকাশযান 'ফিলি' নামের এক ল্যান্ডারকে নামাল ধূমকেতু '৬৭পি/চুরাইমভ গেরাসিমেন্‌কো'-র বরফ কঠিন মাটিতে। ফিলি আসলে ১০০ কেজির একটি গবেষণাগার। মহাকাশ গবেষণায় এই ঘটনা প্রথম বলে জানাল 'ফিলি'-র স্রষ্টা ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ESA)।

খেলার জগৎ

● **পাঁচ বছরের জেল 'ব্লেড রানার'-এর :**

বান্ধবী রিভা স্টিনক্যাম্প-কে খুনের অপরাধে অভিযুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকার 'ব্লেড রানার'-এর অস্কার পিস্তোরিয়াস-কে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি নিজের বাসভবনে বান্ধবীকে গুলি করে হত্যা করে, বেইজিং অলিম্পিকে কৃত্রিম পা (ব্লেড) নিয়ে দৌড়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দেওয়া অস্কার। চলতি বছরের মার্চে মামলার বিচার শুরু হয়।

● **ভারতীয় বিলিয়ার্ডস তারকার বিশ্ব খেতাব :**

ইংল্যান্ডের লিডসে বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্টভিত্তিক ফর্ম্যাটে খেতাব জিতলেন ভারতীয় বিলিয়ার্ডস তারকা পঙ্কজ আডবানি। ফাইনালে তিনি হারান প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার পিটার গিলকিস্টকে। ফল ৬-২। এই নিয়ে একাদশ বিশ্ব খেতাব ঝুলিতে পুরলেন পঙ্কজ আডবানি।

● **ম্যাকাও ওপেন গল্‌ফ খেতাব অনির্বাণ লাহিড়ির :**

ফাইনাল রাউন্ডে অসাধারণ খেলে ম্যাকাও ওপেন গল্‌ফ খেতাব জিতে নিলেন অনির্বাণ লাহিড়ি। চলতি বছরে এটি তাঁর দ্বিতীয় খেতাব এবং কেরিয়ারে পঞ্চম এশীয় খেতাব। ফাইনাল রাউন্ডে তাঁর স্কোর ফাইভ আন্ডার ৬৬। ম্যাকাও ওপেন জয়ের ফলে গল্‌ফ-এর বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ অনির্বাণ ৯০ থেকে ৭২ স্থানে উঠে গেলেন।

● **ডব্লিউটিএ টেনিসে ডাবলস খেতাব সানিয়া-কারা-র :**

সিঙ্গাপুরে ডব্লিউটিএ টেনিসে মেয়েদের ডাবলস খেতাব জিতে নিলেন সানিয়া মির্জা ও জিম্বাবোয়ের কারা ব্ল্যাক জুটি। ফাইনালে তাঁরা ৬-১, ৬-০ সেটে হারালেন চীনা তাইপের সু ওয়েই সিথ ও চীনের সুয়াই পিং জুটিকে।

● **বিশ্ব মিটে সোনা শম্পা গুহ-র :**

লাস ভেগাসে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং-এ সোনা জিতলেন বাংলার শম্পা গুহ। শম্পা নেমেছিলেন ৭৫ কেজি বিভাগে। পাওয়ার লিফটিং এখন আর অলিম্পিক ইভেন্ট না হলেও কদর কমেনি বলে দাবি করেন ১৬ বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এবং এশিয়ান মিটে পাঁচবার সোনাজয়ী শম্পা।

● **আততায়ীর গুলিতে নিহত ফুটবলার :**

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় ফুটবলার তথা অধিনায়ক সেঞ্জো মেয়িওয়া গত ২৭ অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। সে সময় তিনি জোহানেসবার্গের অদূরে ভোসলোরাস শহরে তাঁর বান্ধবী (পপ তারকা) কেলি খুমালের বাড়িতে ছিলেন। ঘাতকেরা সেই বাড়িতে ঢুকে হত্যা করে মেয়িওয়াকে। দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধান জেকব জুমা জানান, পুলিশ ও গোয়েন্দা সেরা পেশাদারি দক্ষতা দিয়ে চেষ্টা করবে, মেয়িওয়ার হত্যাকারীদের ধরতে।

● **অস্ট্রেলিয়া পর্যুদস্ত পাক ক্রিকেটারের দাপটে :**

দুবাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুই টেস্ট সিরিজ ২-০ জিতে বিরল কীর্তি স্থাপন করল পাকিস্তান ক্রিকেট দল। প্রথম টেস্ট ২২১ রানে, দ্বিতীয় টেস্টে পাক দল জেতে ৩৫৬ রানে। রানের বিচারে এটাই সবচেয়ে বড় জয় পাকিস্তানের। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২০ বছর পরে ২-০ সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করলেন মিসবা-উল-হক-এর নেতৃত্বাধীন পাক ক্রিকেটারেরা।

● **বিশ্বসেরার বিরুদ্ধে হকি সিরিজ জয় ভারতের :**

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়াকে পর্যুদস্ত করে ভারতের হকি দল সাড়া ফেলে দিয়েছে। চার টেস্টের সিরিজে ভারতের পক্ষে ফলাফল ৩-১। চারটি টেস্টই হয় পার্থে। প্রথম টেস্টে ভারত ০-৪ হারার পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে দাপটের সঙ্গে খেলে জয় হাসিল করে। শেষ টেস্টে ভারত ৩-১ গোলে হারায় অস্ট্রেলিয়াকে।

● **এশীয় ট্যুরে ফের খেতাব জয় শিবশঙ্করের :**

নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ওপেন গল্‌ফ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের শিবশঙ্কর প্রসাদ চৌরাসিয়া। এশীয় ট্যুরে এটি তাঁর তৃতীয় খেতাব।

● **আরও একটি নতুন পালক রোনাল্ডোর টুপিতে :**

রেকর্ড ভাঙা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে পর্তুগালের মহাতারকা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো-র। ইউরো ২০১৬ সালের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে জয়সূচক গোল করে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতার নজির গড়লেন। এই টুর্নামেন্টে তাঁর গোল সংখ্যা দাঁড়াল ২৩। ভাঙলেন ডেনমার্কের জন ডাল টমাসনের (২২ গোল) রেকর্ড।

● **রোহিত শর্মার অনন্য কীর্তি ও শ্রীলঙ্কা সিরিজ জয় :**

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ একদিনের ম্যাচের সিরিজে ভারত ৫-০ জয়ী হল। ২ নভেম্বর কটকে প্রথম ম্যাচে ভারত ১৬৯ রানে, আমেদাবাদে দ্বিতীয় ম্যাচে ৬ উইকেটে, হায়দ্রাবাদে তৃতীয় ম্যাচেও ৬ উইকেটে জিতে ভারত সিরিজ জয় নিশ্চিত করে। এরপর কলকাতার ইডেনে ভারত ১৫৩ রানে শ্রীলঙ্কাকে পর্যুদস্ত করে। ওই ম্যাচে ভারতের রোহিত শর্মা ২৬৪ রান (১৭৩ বলে) করে একদিনের ক্রিকেটে মহাকীর্তি স্থাপন করেন। এর আগে একদিনের ম্যাচে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল ভারতেরই বীরেন্দ্র সহবাগের দখলে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সহবাগ করেন ২১৯। উল্লেখ্য, একদিনের ম্যাচে রোহিত শর্মা-র এটি দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরি। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০৯ রান করেন। যাই হোক, ঝাড়খণ্ড পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচে ভারত ৩ উইকেটে জিতে সিরিজ ৫-০ করে।

● **ব্যাডমিন্টনে বিরাট সাফল্য সাইনা-শ্রীকান্তের :**

চীনের ফুঝৌতে সাত লক্ষ মার্কিন ডলার পুরস্কার মূল্যের টুর্নামেন্ট চীন ওপেন সুপার সিরিজ ব্যাডমিন্টনে মহিলা ও পুরুষ, দুই বিভাগেই সিঙ্গলস খেতাব জিতলেন সাইনা নেহওয়াল ও কাদম্বি শ্রীকান্ত। ফাইনালে সাইনা হারান জাপানের আকানে ইয়ামাগুচিকে (২১-১২, ২২-২০)। অন্যদিকে শ্রীকান্ত হারান পাঁচ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, ইনচিওন এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী চীনের মহাতারকা লিন ড্যানকে (২১-১৯, ২১-১৭)।

● **বর্ষসেরা ক্রিকেটার ভুবনেশ্বর কুমার :**

বছরের (২০১৩-১৪) সেরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসাবে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার (BCCI) পুরস্কার 'পলি উম্রিগড় ট্রফি' পান জাতীয় দলের তরুণ পেস বোলার ভুবনেশ্বর কুমার। এই সময়ের মধ্যে ৭টি টেস্ট খেলে ২২টি উইকেট এবং ২৬৩ রান করেন ভুবনেশ্বর। এছাড়াও ২২টি একদিনের ম্যাচে ১৭টি উইকেট পান। অন্যদিকে, আজীবনের স্বীকৃতি হিসাবে এ বছর 'সিকে নায়ডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' পুরস্কার পান দিলীপ বলবন্ত বেঙ্গসরকার।

● **টেস্ট জয় মহিলা ক্রিকেট দলের :**

মেয়েদের টেস্ট ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক ইনিংস ও ৩৪ রানে পর্যুদস্ত করে আলোড়ন সৃষ্টি করল মিতালি রাজের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : প্রথম ইনিংস ৪০০-৬ (ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা)। দক্ষিণ আফ্রিকা : প্রথম ইনিংস ২৩৪ ও ১৩২।

বিবিধ সংবাদ

● **নিলামে বন্ডের 'উভচর' গাড়ি :**

১৯৭৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দ্য স্পাই হু লাভ্‌ড্‌ মি' ছবির একটি দৃশ্যে জেমস বন্ডকে একটি গাড়ি চালাতে দেখা যায়। সেখানে নায়ক জেমস বন্ডের তীব্র গতির ওই গাড়ি রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ জলে নেমে পড়ে। সেখানেও একই গতিতে ছুটতে থাকে গাড়িটি। সেই উভচর গাড়িটি এবার নিলামে উঠতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে নিলামে গাড়িটির দাম ২০ লক্ষ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে। তবে এই গাড়িটি বাস্তবে চালানো যাবে না।

● **ডে-লা-রেন্টা প্রয়াত :**

বিশ্বখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার অস্কার ডে-লা-রেন্টা (৮২) প্রয়াত হলেন। দীর্ঘদিন ক্যান্সারে ভুগছিলেন। জ্যাকলিন কেনেডি-সহ হোয়াইট হাউসের ফার্স্ট লেডিদের পোশাক রেন্টার ডিজাইনেই তৈরি। এছাড়াও বহু হলিউড তারকার পোশাকও তাঁর ডিজাইন করা।

● **'লরেল অব দান্তে' সম্মান প্রথম বাঙালির :**

প্রথম বাঙালি হিসাবে ইতালির দান্তে কালচারাল সেন্টারের সর্বোচ্চ সম্মান 'লরেল অব দান্তে' পেলেন বিশিষ্ট অনুবাদক শ্যামলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ইতালির মহাকবি দান্তে অ্যালিথিয়েরির লেখা 'ডিভাইন কমেডি' বাংলায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করার জন্য এই স্বীকৃতি। পুরস্কারদাতা কমিটি, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে ডিভাইন কমেডি-র সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হলে, অনুবাদককে পুরস্কৃত করে থাকে।

● **চলে গেলেন বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি :**

বিশ্বখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর প্রাক্তন সম্পাদক বেঞ্জামিন ব্র্যাডলি (৯৩) প্রয়াত হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওনার দক্ষতাতেই 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি'-র তথ্য ফাঁস করে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' খ্যাতির শীর্ষে উঠে আসে। ওই সংবাদের জেরে পদত্যাগ করতে হয় সে সময়ের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনকে। 'সত্যিকারের সংবাদপত্রের লোক' হিসাবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন বেঞ্জামিন। ২০১৩ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানও পান।

● **সম্মানিত উপাচার্য :**

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব এক্সেটরে সাম্মানিক অধ্যাপক হিসাবে বক্তৃতা দেওয়ার সম্মান পেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। তিন বছরের জন্য এই সম্মান পাচ্ছেন তিনি। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ভারতের ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি।

● **শূন্যে ঝাঁপে বিশ্ব রেকর্ড গুগল কর্তার :**

বায়ুমণ্ডলের প্রান্তসীমা থেকে মাটিতে ঝাঁপ দেওয়ার বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন গুগল সংস্থার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালান ইউস্টাস। মহাশূন্য থেকে মাটির দূরত্ব ছিল প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ফুট। অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় গুগল কর্তা বিশেষভাবে তৈরি স্যুট পরে বেলুনে চড়ে প্রান্তসীমায় পৌঁছান। সেখান থেকে মিনিটে হাজার ফুট গতিতে নীচে ঝাঁপ দেন। এই পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। নেমে আসার সময় প্রায় দেড় মিনিট সম্পূর্ণ ভরশূন্য হয়ে কাটাতে হয় তাঁকে।

● **টমাস ফ্র্যাঙ্ক স্মরণ লন্ডনে :**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিবাহিনীর সর্বাত্মক আক্রমণের জেরে জলের তলায় বিলীন হয়ে যেতে বসেছিল লন্ডন। ব্রিটেন পার্লামেন্ট হাউস

আর টেমস নদীর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচিলটা জার্মান বোমার ঘায়ে ধসে পড়লেই টেমস নদী ভাসিয়ে দিত লন্ডন শহর। কিন্তু নাৎসিরা শত চেষ্টাতেও তা পারেনি। কারণ ইঞ্জিনিয়ার-গবেষক টমাস ফ্র্যাঙ্ক ও তাঁর দল, সর্বোচ্চ কারিগরি দক্ষতায় এমনভাবে প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন, যা শেষ বিচারে হয়ে উঠছিল অভেদ্য (সেই প্রাচীর এখন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ)। দীর্ঘ সাত দশক পর ২৯ অক্টোবর, সরকারি ব্যবস্থাপনায় এক অনুষ্ঠানে টমাস ফ্র্যাঙ্ক আর তাঁর সহযোগীদের স্মরণ করা হল। সংবাদ সংস্থা এই ঐতিহাসিক তথ্য সারা বিশ্বকে জানিয়েছে।

● **স্কুলের জন্য মালালার দান :**

প্যালেস্তাইনের গাজা ভু-খণ্ডে ইজরায়েলি বিমান হানায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া স্কুলগুলির পুনর্গঠনে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন শান্তিতে নোবেলজয়ী পাক কিশোরী মালালা ইউসুফজাই। নোবেল পুরস্কার বাবদ পাওয়া অর্থের একটা বড় অংশ তিনি ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে দান করলেন। গাজা ভূখণ্ডে কর্মরত রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা মিশনের কমিশনার পিয়েরে বলেন, মালালার এই দান ২৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে উৎসাহ জোগাবে এবং ৯ হাজার শিক্ষাকর্মীর মনোবল বাড়াবে।

● **ভোপাল গ্যাস কাণ্ডে অভিযুক্ত অ্যান্ডারসন প্রয়াত :**

১৯৮৪ সালের ২-৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক কারখানায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত মিথাইল আইসো-সায়ানেট গ্যাস লিক করে। সরকারি হিসাবেই ৩৭৮৭ জন প্রাণ হারান। কিন্তু বেসরকারি মতে, মৃতের সংখ্যা ১০০০০ হাজারের বেশি। বিশ্ব ইতিহাসে শিল্পক্ষেত্রে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ওয়ারেন অ্যান্ডারসন (৯৩) প্রয়াত হলেন। তিনি ছিলেন ওই অভিশপ্ত বহুজাতিক কোম্পানির চেয়ারম্যান।

● **জাপানি সম্মান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর :**

দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক ধরে ভারত-জাপান মৈত্রী সম্পর্ক উন্নত থেকে উন্নতর করে তোলার কাজে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে জাপানের জাতীয় সম্মান, 'দ্য গ্র্যান্ড কর্ডন অব দ্য অর্ডার অব দ্য পউলোনিয়া ফ্ল্যাওয়ার্স', তুলে দেওয়া হল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর হাতে। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান পেলেন।

● **আকাশছোঁয়া দামে নিলাম ভ্যান গঘের ছবি :**

সাদা মার্বেলের টেবিলের ওপর রাখা একটি ফুলদানিতে সাজানো লাল, নীল, সাদা এক ঝাঁক রকমারি ফুল। হালকা সবুজ ক্যানভাসে এই ছবিটি, বিশ্ববন্দিত শিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ, এঁকেছিলেন ১৮৯০ সালে, মৃত্যুর কয়েক মাস আগে। ছবিটির নাম 'ভাস উইথ ডেজিজ অ্যান্ড পপিজ'। সেই ছবিটি নিউইয়র্কের সোদবির নিলামে বিক্রি হয়ে গেল ৬.১ কোটি ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩৭৫ কোটি টাকা।

● **শতাব্দী প্রাচীন ডায়েরির সন্ধান :**

১৯১২ সালে ক্যাপ্টেন রবার্ট স্কটের কুমেরুবিন্দু আবিষ্কার অভিযানের ঘোষিত ফোটোগ্রাফার (বিশিষ্ট চিকিৎসক ও জীবতত্ত্ববিদ) জর্জ মারে লেভিকের নামাঙ্কিত একটি ডায়েরির সন্ধান পাওয়ার খবরে সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে গেছে। কারণ, ওই কুমেরু অভিযান শেষ করে ফেরার পথে ক্লান্তি, খাদ্যাভাব ও অত্যধিক ঠান্ডায় স্কট ও তাঁর সকল সঙ্গীই প্রাণ হারানোর একশো দুই বছর পরে, এই প্রথম কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল। ১৯১০ সালে প্রস্তুতি পর্ব থেকে অন্তিম অভিযানের আগে পর্যন্ত যা কিছু হয়েছিল, তার বিবরণ ডায়েরিতে লেখা রয়েছে বলে দক্ষিণ মেরুর কেপ-ইভান্সে রবার্ট স্কট সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

● **বার্লিন প্রাচীর সরিয়ে সংযুক্তিকরণের পঁচিশ বছর :**

১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর, পশ্চিম আর পূর্ব জার্মানির মধ্যে বিভেদের প্রতীক বার্লিন প্রাচীর ভেঙে পড়ে উত্তাল জনরোষে। দুই জার্মানি এক হয়ে যায়। তারপর ২৫ বছর অতিক্রান্ত। জার্মানির মানুষ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ওই ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করেন।

● **সম্মানিত বেলাফন্ডে :**

মানববন্ধু মার্টিন লুথার কিং-এর একান্ত সহযোদ্ধা হ্যারি বেলাফন্ডে-কে 'জিন হর্সহোল্ট' পুরস্কারে সম্মানিত করল 'অ্যাকাডেমি অব মোশান পিকচার্স আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স'। নিপীড়িত মানুষের জন্য তাঁর কণ্ঠস্বর সদাই সরব। পাশাপাশি তিনি ছিলেন জনপ্রিয় গায়ক। বিশিষ্ট এই মার্কিনির বয়স এখন ৮৭। উল্লেখ্য, চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ক অ্যাকাডেমির দেওয়া এই পুরস্কারকে 'জনকল্যাণে অস্কার' বলা হয়।

● **'মহাভারত' খ্যাত রবি চোপড়া প্রয়াত :**

১৯৮০-র দশকে তুমুল জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়াল 'মহাভারত'-এর পরিচালক রবি চোপড়া ১২ নভেম্বর প্রয়াত হলেন। প্রখ্যাত পরিচালক ও প্রযোজক বি. আর. চোপড়ার ছেলে রবি চোপড়া 'মহাভারত' মহা সিরিয়াল ছাড়াও, 'জমির' (১৯৭৫), 'দ্য বার্নিং ট্রেন' (১৯৮০), 'মজদুর' (১৯৮৩), 'দহলিজ' (১৯৮৬), 'বাগবান' (২০০৩)-এর মতো সাড়া জাগানো ছবি পরিচালনা করেন। তাঁর প্রযোজনা ও পরিচালনায় সর্বশেষ দুটি ছবি অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'ভূতনাথ' এবং 'ভূতনাথ রিটার্নস' ভালো সাড়া পায়।

● **বসবাসের শ্রেষ্ঠ ভূমি জার্মানি :**

আন্তর্জাতিক এক সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী, মানুষের বসবাসের জন্য বিশ্বে সেরা দেশ এখন জার্মানি। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-নিরাপত্তার নিরিখেই এই মান নির্ণয় করা হয়। সেদিক থেকে জার্মানির পরেই রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (২০০৯ থেকে তারা ছিল প্রথম স্থানে)। তৃতীয় ব্রিটেন। চতুর্থ ফ্রান্স। পঞ্চম কানাডা।

● **শিশু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ :**

পাকিস্তানের বন্দর শহর করাচির কুরেশি দম্পতির একমাত্র ছেলে আয়ন কুরেশির বয়স এখনও ৬ পেরোয়নি। এরই মধ্যে 'কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ'-র শিরোপা তার দখলে। সম্প্রতি, 'মাইক্রোসফ্ট' আয়োজিত

'বিশেষজ্ঞ' পরীক্ষায়, গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল আয়ন।

● **নিলামে চড়া দামে বিক্রি নেপোলিয়নের টুপি :**

প্যারিসের অদূরে ফঁতানারো শহরে 'ওসেনা' সংস্থা আয়োজিত নিলামে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের ব্যবহার করা একটি টুপি ২২ লক্ষ মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়ে গেল। ভারতীয় মুদ্রায় ১৫ কোটি টাকা। শোনা যায়, ১৮০৪ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত ফরাসি সম্রাট থাকাকালীন ১২০ রকমের টুপি মাথায় চাপিয়েছেন। নিলামে বিক্রি হয়ে যাওয়া টুপির নকশা এমনভাবে তৈরি যাতে হাজারো ভিড়েও তা চোখে পড়বে।

● **বিশ্বের সবচেয়ে প্রবীণ দম্পতি :**

চীনের এক দম্পতির মিলিত বয়স ২১৭। স্বামী পিং মুহুর বয়স ১০৯ বছর, আর স্ত্রী ঝ্যাং শিনিউ-র বয়স ১০৮ বছর। এই মুহূর্তে এরাই হলেন বিশ্বের প্রবীণতম দম্পতি। এই দম্পতির ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির সংখ্যা ৬০-এর ওপরে।□

সংকলক : দেবাংশু দাশগুপ্ত

সংশোধন

যোজনা (বাংলা) পত্রিকার জুন ২০১৪ সংখ্যায় (পৃ. ৪৫) লক্ষ্মীনারায়ণ শীল রচিত "ভারতে কৃষি উন্নয়নে সমবায়" শীর্ষক নিবন্ধে ভুলবশত প্রকাশিত হয়—".....ভারত সরকারের ৫ আগস্ট **২০১৪** তারিখের অধ্যাদেশ অনুসারে অধ্যাপক এ. বৈদ্যনাথনের সভাপতিত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়।" সঠিক তথ্যটি হল—".....ভারত সরকারের ৫ আগস্ট **২০০৪** তারিখের অধ্যাদেশ অনুসারে অধ্যাপক এ. বৈদ্যনাথনের সভাপতিত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়।" অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

জা নে ন কি?

আর্থিক বিশ্বায়ন (ফিনানশিয়াল গ্লোবালাইজেশন)

আনন্দ গুপ্ত

অর্থের আন্তর্দেশীয় প্রবাহ। অর্থনীতির বস্তুগত ক্ষেত্রের বিশ্বায়নের সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রের বিশ্বায়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বলা যেতে পারে আর্থিক বিশ্বায়ন ব্যতীত বস্তুগত ক্ষেত্রের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণতা পায় না। বস্তুগত ক্ষেত্রের বিশ্বায়ন বলতে মূলত বোঝায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য ও পরিষেবার অবাধ যাতায়াত। কিন্তু এই যাতায়াত তখনই সুগম হয়ে উঠবে যখন পাশাপাশি অর্থের প্রবাহটিও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠবে।

অর্থের আন্তর্দেশীয় প্রবাহ ঘটে মূলত তিনটি রাস্তায়। বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচার মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির ঋণদানের মাধ্যমে এবং মূলধনি বাজারে লগ্নির মাধ্যমে। এছাড়াও আছে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। এক দেশ থেকে আরেক দেশে অর্থের এই প্রবাহ কতটা বাঞ্ছনীয় তা নিয়ে জোরদার বিতর্ক তৈরি হয়েছিল উনিশশো আশির দশকে, যা অদ্যাবধি অব্যাহত। বস্তুত উনিশশো আশির দশকে লাতিন আমেরিকা এবং উনিশশো নব্বইয়ের দশকে মেক্সিকো ও কিছু এশীয় দেশের অর্থনীতিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে অতিরিক্ত আর্থিক বিশ্বায়নকে চিহ্নিত করার পর থেকেই এই বিতর্কের সূত্রপাত। বিতর্কের একদিকে আছেন সেই সব অর্থনীতিবিদ যাঁরা মনে করেন অর্থ ও পুঁজির অবাধ যাতায়াত বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে। তাই অর্থ ও পুঁজির আন্তর্দেশীয় যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত। আর এই ভাবনার বিপরীত শিবিরে যাঁরা আছেন তাঁদের মতে অর্থ ও পুঁজির যাতায়াতকে নিয়ন্ত্রণ করলে ক্ষতি হবে অনুন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলিরই, কারণ তখন পুঁজির অভাবে বিঘ্নিত হবে তাদের আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়া।

বলা বাহুল্য, দু'পক্ষের যুক্তিরই সারবত্তা আছে। তাই আর্থিক বিশ্বায়ন কতটা ভালো বা কতটা মন্দ সেটা খতিয়ে দেখার জন্য এর ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণটুকু আরেকটু খুঁটিয়ে করা দরকার। আর্থিক বিশ্বায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষেত্রে বিকাশশীল দেশগুলির লগ্নি পেতে কতটা সুবিধা হচ্ছে শুধু সেটুকু না দেখে, দেখা দরকার এই লগ্নি অর্থনীতির আর কী কী সুবিধা বা অসুবিধা ডেকে আনছে।

যেমন বিদেশি পুঁজির প্রথম সুবিধা দেশীয় উৎপাদন ক্ষেত্রকে তা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে দিয়ে তার উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়। তবে এই পরোক্ষ সুবিধাটি পাবার জন্য ন্যূনতম দুটি শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। এক, সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ক্ষেত্রকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতে হবে। দুই, উৎপাদন ক্ষেত্রটির বিকাশের জন্য আনুষঙ্গিক পরিকাঠামোটি আগেই তৈরি রাখতে হবে। বস্তুত এই শর্ত দুটির পিছনেই লুকিয়ে আছে আর্থিক বিশ্বায়নের সাফল্যের চাবিকাঠি। কোনও বিকাশশীল দেশ বিদেশি অর্থ ও পুঁজির সাহায্যে নিজের আর্থনীতিক বিকাশকে সমৃদ্ধতর করতে তখনই পারবে যখন পরিকাঠামো ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহের যথাযথ বিকাশ ঘটিয়ে বিদেশি অর্থ ও পুঁজির জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হবে। আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে কী আছে? আছে উপযুক্ত সরকারি নীতি, সুগঠিত অর্থ ও পুঁজির বাজার, উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। এই প্রসঙ্গে আর যেটা মনে রাখা দরকার সেটা হল এই অপ্রত্যক্ষ সুবিধাগুলি পেতে দীর্ঘ সময় লাগে, তাই অনেক সময় সেগুলি যে আর্থিক বিশ্বায়নের ফসল তা খেয়ালই থাকে না। কিন্তু আর্থিক বিশ্বায়নের ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণে সেগুলি মনে রাখা দরকার।

আর্থিক বিশ্বায়নের সম্ভাব্য পরোক্ষ সুবিধাগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। আর্থিক বিশ্বায়নের ফলে সরকারি নীতিসমূহ আরও সুনির্দিষ্ট এবং শক্তপোক্ত হয়, অর্থ ও পুঁজির বাজার এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলি আরও সুগঠিত হয়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে আর্থিক বিশ্বায়নের সাফল্যের জন্য ঠিক যে সমস্ত ক্ষেত্রের প্রাথমিক বিকাশের কথা শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আর্থিক বিশ্বায়ন আবার সেই সমস্ত ক্ষেত্রকেই আরও উন্নত করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, বিকাশশীল দেশগুলির অর্থ ও পুঁজির বাজারে কাঠামোগুলি ততটা শক্তপোক্ত হয় না। হয় না কারণ অর্থের প্রবাহ প্রচুর পরিমাণ হলে কী কী বিপদ তৈরি হাতে পারে তা জানা না থাকায় সরকারও সেইভাবে নীতি নির্ধারণ করে উঠতে পারে না। অতঃপর এই অবস্থায় বিদেশি পুঁজি ঢুকে পড়লে নানা ধরনের দুর্নীতি জন্ম নিতে শুরু করে। সরকার তখন ফাঁকফোকর ভরাট করে আরও শক্তপোক্ত, আরও সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ করে, অর্থ ও পুঁজির বাজারের সঙ্গে যুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলি সুগঠিত হয়ে ওঠে। উনিশশো আশির দশকের শেষদিক থেকে ভারতীয় আর্থিক ক্ষেত্রের বিবর্তন প্রক্রিয়াটি লক্ষ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। অন্যদিকে যদি বিকাশশীল দেশগুলির অর্থ ও পুঁজির বাজারের ন্যূনতম পরিকাঠামো তৈরি না থাকায় বিদেশি পুঁজিকে অবাধ প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে পুরো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোটিই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। এই সমস্ত কারণেই বলা যেতে পারে, আর্থিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে যথাযথ প্রস্তুতির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।❑

প্র | তি | যো | গি | তা | প্র | স্তু | তি

ফ্যাশন দুনিয়ার পেশাদাররা

মহুয়া গিরি

ভারতে কৃষিক্ষেত্রের পরে টেক্সটাইল শিল্পেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ কাজ করে। এই শিল্পে যেমন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিত পেশাদারদের প্রয়োজন তেমনি দরকার প্রচুর সাধারণ শ্রমিকেরও। বস্ত্রমন্ত্রকের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রায় ৩৫০ লক্ষ মানুষের পেশা এখন এই শিল্পকে ঘিরেই।

ডিজাইনার স্টোর কিংবা ছোট-বড় দোকান হয়ে ক্রেতার কাছে জামাকাপড় পৌঁছানো পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপে কাজ করেন ফ্যাশন দুনিয়ার পেশাদাররা। আজকের দুনিয়ায় সকলেই বেশ ফ্যাশন সচেতন এবং ফ্যাশনের জগৎটা শুধু জামাকাপড়ের গণ্ডিতেই আর সীমাবদ্ধ নেই। ফ্যাশন কি শুধু রুপোলি-পর্দার জগতের? না। খেলাধুলা, প্রশাসনিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্র, বাণিজ্য-জগৎ, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র—সব জায়গায় ফ্যাশন, ফিউশন ফ্যাশন—ফ্যাশন মেনে বিয়ের সাজের চল তো অনেক কালের।

ফ্যাশন নিয়ে কী কী পড়া যায়

পোশাক তৈরি থেকে বিক্রি—দুনিয়া জুড়ে পোশাকের ব্যবসায় নানা স্তরে প্রচুর মানুষ কাজ করেন। কাপড়-প্রস্তুতকারী, ডিজাইনার, বিপণন বিশেষজ্ঞ এমন নানা পেশায় অনেক মানুষ যুক্ত আছেন। এছাড়াও ফ্যাশন দুনিয়াকে ঘিরে আছে ফ্যাশন ফোটোগ্রাফি, ফ্যাশন জার্নালিজমের মতো আরও বেশ কয়েকটি পেশা। যেমন দেশের বিভিন্ন ফ্যাশন কলেজগুলিতে যে কোর্সগুলি করানো হয়, সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল ফ্যাশন ডিজাইনিং, ফ্যাশন টেকনোলজি, ফ্যাশন ম্যানেজমেন্টের মতো কোর্সগুলি। কোথাও প্রয়োজন শিল্প সুষমার, কোথাও কলাকৌশল ও ম্যানেজিরিয়াল দক্ষতার। ভালো কথা বলতে পারা ও ভালো লেখার হাত থাকলে নিজের কাজ দশজনের সামনে ভালোভাবে উপস্থাপিত করা যায়। ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট পড়লে ব্যবসায়িক বুদ্ধি পোক্ত হয়, বোর্ডরুমের যুদ্ধগুলো জিতে নেওয়া যায় সহজে। সঙ্গে ফ্যাশন ডিজাইন ডিগ্রি থাকলে 'স্টাইল স্কিল' আরও ধারালো হয়।

ফ্যাশন ডিজাইনিং

ফ্যাশন ডিজাইনিং-কে পেশা হিসেবে বেছে নিতে হলে অবশ্যই সৃজনশীল হতে হবে। শুধু তাই নয় নতুন নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতা না থাকলে এই দুনিয়ায় টিকে থাকা মুশকিল। ফ্যাশনের দুনিয়া প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে। বদলাচ্ছে ক্রেতার পছন্দ, অপছন্দ। আর সেই বদলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাতে হবে নিজের ডিজাইনকেও। শুধু রাজ্য বা দেশ নয়, খবর রাখতে হবে পৃথিবী জুড়ে নতুন কী হচ্ছে। কম্পিউটার ও সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং বা গ্রাফিক ডিজাইনিং জানা থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। পেন্টিং, ড্রয়িং ও ফোটোগ্রাফির জ্ঞান থাকলেও হাতে-কলমে কাজ করার সময় খুব কাজে দেয়। ফ্যাশন বললে, সাধারণত জামাকাপড়ের কথাই মনে হয়। কিন্তু ফ্যাশন ডিজাইনাররা জুতো, অন্তর্বাস, খেলোয়াড়দের পোশাক, বাচ্চাদের পোশাক, ব্যান্দানা, স্কার্ফ ইত্যাদি নানা জিনিস তৈরি করেন। কেমন জামা হবে, কাট কেমন, কারা পরবে সে সবের জন্য আঁকার ক্ষমতা, রঙের বোধ, নিজের হাতে জামাকাপড় বানানোর দক্ষতা লাগে। চাকরি না করে ফ্রিলান্স হিসেবে কাজ করলে, ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা ও ব্যবসা বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। প্রথামাফিক পড়াশোনা শেষ করে কোনও নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনারের কাছে কিছুদিন কাজ করা ভালো। অ্যাকসেসরি অর্থাৎ জুতো, বেল্ট, টুপি, হ্যান্ডব্যাগ, গ্লাভস ইত্যাদির কাজ করতে হলে কোন পোশাকের সঙ্গে কোনটা মানাবে এসব মাথায় রেখে ডিজাইন ভাবতে হয়।

কস্টিউম ডিজাইনিং

ব্যবসার ঝক্কি নিতে না চাইলে ডিজাইনিং নিয়ে পড়াশোনা করে কস্টিউম ডিজাইনার হওয়া যায়। এঁদের কাজটা কী? বিভিন্ন ফিল্ম, টিভি, নাটক কিংবা ইভেন্টে প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাক তৈরি করেন এঁরা। তাছাড়াও স্কেচ করে কস্টিউম বানান, সমস্ত প্রোডাকশনের কস্টিউম বাজেটও তৈরি করেন। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকার মতো ভারতেও থিম পার্টির চল বাড়ছে। শুধুমাত্র জন্মদিন, বিয়ে বা বিবাহ-বার্ষিকীর মতো পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, নিউ ইয়ার, ক্রিসমাস বা হ্যালউইন উপলক্ষে থিম পার্টির জন্য পোশাক তৈরি করেন কস্টিউম ডিজাইনাররা।

ফ্যাশন জার্নালিজম

ফ্যাশন এবং ডিজাইন ও তার খবরাখবর নিয়েই ফ্যাশন জার্নালিজমের দুনিয়া। ফ্যাশন জগতের যাবতীয় খুঁটিনাটি নিয়ে লেখা তৈরি করা, কপি সম্পাদনা ও পরিমার্জিত করা থেকে ফোটো শুটের স্টাইল ঠিক করা সবই করতে হয় ফ্যাশন জার্নালিস্টদের। ফ্যাশন নিয়ে আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে ঝরঝরে লেখার দক্ষতা থাকলেই যে কেউ ফ্যাশন জার্নালিজমকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন। এলেমদার ফ্যাশন জার্নালিস্ট হতে গেলে জানতেই হবে ফ্যাশন জগতের খুঁটিনাটি, হালহকিকত, তার পরিসর। বুঝতে হবে ফ্যাশনের মায়াবী জগতের দুনিয়াটা। জানতে

হবে ফ্যাশনের ভোল বদলের ইতিবৃত্ত। ফ্যাশন জার্নালিজমে কোনও ডিগ্রি আছে কি না সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা হল, ওই সাংবাদিক ফ্যাশন জগতের আকাশ-মাটি-জল চেনে কি না। ফ্যাশনের নিত্য পরিবর্তনশীল রূপ ও রূপান্তর নিয়ে সে আগাগোড়া খোঁজ রাখে কি না। তবে হ্যাঁ, ফ্যাশন সংক্রান্ত জনসংযোগের ওপর কোর্স করা থাকলে সাংবাদিকদের অনেকটাই সুবিধা হবে। উচ্চগুণমানের সাংবাদিকতা করতে হলে সাংবাদিকের সৃজনশীলতা, চিন্তাভাবনায় নিজস্বতা থাকতেই হয়। একই সঙ্গে একজন ফ্যাশন সাংবাদিককে জনসংযোগ এবং খবরাখবরের নিজস্ব 'সোর্স' ও 'নেটওয়ার্ক' গড়ে তুলতে হয়। ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি একেবারে উঁচুতলা থেকে একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত মিশে যেতে হয় খবরের সন্ধানে। ফোটোগ্রাফার, মেকআপ শিল্পী, স্টাইলিস্ট, ডিজাইনার এবং বিভিন্ন সংস্থার জনআধিকারিকদের মতো ফ্যাশন দুনিয়ার বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলাপ জমানো এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখার কাজটা নিয়মিত করতে হবে। বিভিন্ন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ছাড়াও এই পেশায় কাজের সুযোগ বাড়ছে। বিভিন্ন অনলাইন কনটেন্ট রাইটার বা স্বাধীন ব্লগার হিসেবেও কেউ ফ্যাশন জার্নালিজম পেশা বেছে নিতেই পারেন।

ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট

নতুন 'কুতুর' কালেকশন ডিজাইন করা, নতুন বুটিক খোলা, দুনিয়া জোড়া 'বায়িং ট্রিপ'-এর পরিকল্পনা বা ঠিক কীভাবে পোশাক সাজিয়ে রাখলে ক্রেতার নজরকাড়া যাবে— ইত্যাদির মতো ফ্যাশন দুনিয়ার খুঁটিনাটি সুষ্ঠুভাবে চালনা করার জন্য ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট পেশাদারদের প্রয়োজন। ক্লাসরুমের পাঠ শেষ হলে ছাত্রছাত্রীরা ইন্টার্নশিপের সুযোগ পায় নানা রিটেল স্টোরে। তাতে ফ্যাশন রিটেল সেলস আর ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে হাতে-কলমে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়। ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং, কো-অর্ডিনেশন, ঠিকঠাক টেক্সটাইল বেছে নেওয়া, ছোটখাট ব্যবসা সামলানো, বিজ্ঞাপন ও মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, রিটেল ম্যানেজমেন্ট, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং—সব কিছুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। রিটেল বায়িং কাকে বলে, কীভাবে উইন্ডো ড্রেসিং করানো হয়, ফ্যাশন শো আয়োজন করতে গেলে কী কী মাথায় রাখতে হবে, ক্রেতার সঙ্গে ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, জন-সংযোগ সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটি থাকে পাঠ্যক্রমে। বেশিরভাগ পাঠ্যক্রমই কনজিউমার বিহেভিয়ারের ওপর বাড়তি জোর দেয়। আসলে উপভোক্তারা কী চাইছেন, তার ভিত্তিতেই বদলে যায় ফ্যাশনের হাল, বদলায় কেনাকাটার ধরনও। অনলাইন রিটেলিং, ইলেকট্রনিক রিটেলিং বা ক্যাটালগ ডেভেলপমেন্টের মতো কাজও করা যায়। ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে রিটেলিং ফ্যাশন হিস্ট্রি, কালার থিওরি, ফ্যাশন ড্রয়িং, ডিজিটাল ইমেজিং, মাল্টিমিডিয়া, ওয়েব অ্যাডভার্টাইজিং/মার্কেটিং, ইভেন্ট, প্রোমোশন, অ্যাকাউন্টিং, অ্যাপারেল ইভ্যালুয়েশন, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং, ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, স্টোর ম্যানেজমেন্ট, ব্র্যান্ড মার্কেটিং, স্টোর প্ল্যানিং, কনজিউমার বিহেভিয়ার, কপিরাইট ল, ট্রেন্ড, মিডিয়া প্ল্যানিং, মার্কেটিং রিসার্চের প্রাথমিক তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা—এরকম আরও নানা বিষয় নিয়ে পড়ানো হয়।

ফ্যাশন ম্যানেজমেন্টে সেল্‌স স্ট্র্যাটেজি তৈরি করে সেটাকে কাজে লাগানোর ওপর খুব জোর দেওয়া হয়। রিটেল বায়িং প্র্যাকটিস বা ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং নিয়ে অনলাইনেও পড়াশোনা করা যায়। শেখানো হয় ইনভেন্টরি কন্ট্রোল বা কস্ট অ্যানালিসিসের কায়দা। এগুলো হাতে-কলমে শেখার পর কেনাকাটি, রানওয়ে শো কো-অর্ডিনেশন, সেল্‌স কনসালটেশন, ম্যানুফ্যাকচারার্স রিপ্রেজেন্টেশনের মতো ফ্যাশন আর ডিজাইনের দুনিয়ার সমস্ত খুঁটিনাটিই জানা হয়ে যায়।

যে কোনও ব্যবসার ক্ষেত্রে হাতে-কলমে কাজের সময় দেখা যায় কলেজের সিলেবাসের বাইরে আরও অনেক কিছুই শেখার আছে, জানার আছে। এক্ষেত্রে কীভাবে রানওয়ে শো কো-অর্ডিনেট করা হয়, উইন্ডো ডিসপ্লে তৈরি করা হয় কিংবা শোরুম সাজানোর মতো আপাত গুরুত্বহীন কিন্তু অসম্ভব জরুরি কাজগুলো হাতে-কলমে শেখার সুযোগ মেলে কোর্সের মধ্যেই। কনজিউমার বিহেভিয়ার, ফ্যাশন সাইকল বা ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং-এর মতো ব্যাপারগুলো আপাত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ব্যবসা চালানোর জন্য শিখে নেওয়া ভীষণ জরুরি। ফ্যাশনের সৃষ্টিশীল ভাবনাটা বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি ম্যানেজমেন্টের পাঠটাও শিখে নিতে হয়। না হলে রিটেলের প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা খুব মুশকিল। 'স্টাইল সেন্স'-এর পাশাপাশি ব্যবসার বুদ্ধি থাকলে ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট তাদের জন্য একেবারে আদর্শ কেরিয়ার অপশন।

ভারতে ফ্যাশন ব্যবসার ভবিষ্যৎ

বহুদিন ভারত থেকে কেবল জামাকাপড় আউটসোর্স করত বিদেশি কোম্পানিগুলো, এখন কিন্তু এদেশে তৈরি আধুনিক ডিজাইনের জামাকাপড় আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ ভালো দামেই বিক্রি হয়। আর্থিক মন্দার জেরে বাজারের অবস্থা যতটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল তার ধাক্কাটা এখন অনেকটাই সামলে ওঠা গেছে। তবে চাকরির চেয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু করা ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা সব মহলেই প্রশংসা কুড়োচ্ছে। প্রতিভাবান ডিজাইনাররা নিজস্ব ব্র্যান্ড শুরু করার সাহস জুটিয়ে উঠতে পারছেন। ইউরোপ-আমেরিকার বহু বড় কোম্পানি এ দেশের ডিজাইনারদের দিয়ে ডিজাইন করিয়ে, কম খরচে জামাকাপড় বানিয়ে নিয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ফ্যাশন ম্যানেজাররা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা না বললেও বোঝা যায়।

দেশের রিটেল বিজনেসে (খুচরো ব্যবসা) দ্বিতীয় বৃহত্তম সেক্টর হচ্ছে অ্যাপারেল (পোশাক)। আশা করা হচ্ছে প্রতি বছর ১২ থেকে ১৫ শতাংশ হারে বাড়বে ব্যবসা। ২০১০ সালের মধ্যে রিটেল মলের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ হারে। মনে করা হচ্ছে ২০১৫ সালের শেষদিকে দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শহরগুলোতে বড়সড় উন্নতি হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের নামকরা খুচরো বিক্রেতারাও এদেশের বাজারে আসার জন্য

উন্মুখ। এখন কেবল সিঙ্গল ব্র্যান্ড রিটেল আউটলেটগুলোতে ১০০ শতাংশ প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) অনুমতি আছে। মাহিন্দ্রা গ্রুপের মাহিন্দ্রা রিটেল ডিভিশন ২০১০ সালে ১৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে 'মম অ্যান্ড মি' নামক রিটেল আউটলেট খুলেছে।

সারা বিশ্বের খুচরো বিক্রেতারা এদেশে ব্যবসা করতে আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে দেশে ভালো মানের জিনিস না তৈরি হলে খুচরো ব্যবসার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

চাকরির সুযোগ

যে কোনও বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এখন ক্যাম্পাসিং-এর সুযোগ রয়েছে। নামকরা দেশি ও বিদেশি কোম্পানিগুলোতেই এখন প্রশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের চাহিদা অনেক। দেশে খুচরো ব্যবসার রমরমা বাজার এখন, প্রচুর ডিজাইনার আউটলেট খুলছেন, প্রফেশনালি শিক্ষিত ম্যানেজার ছাড়া এই পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। কাজের সুযোগ রয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বুটিক, ডিজাইনার শোরুমে বা বড় ব্র্যান্ডের অ্যাপারেল স্টোরে। চাহিদা রয়েছে ডিজাইনারেরও। ফ্যাশন ম্যানেজার হিসেবে পড়াশোনা শেষ করেই যে চাকরিগুলো পাওয়া যেতে পারে সেগুলো হল :

- ✦ রিটেল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি
- ✦ রিটেল আর হোলসেল সেল্‌স
- ✦ স্টাইলিস্ট
- ✦ ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজার

বহু জায়গায় ফ্যাশন ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি রিটেল ম্যানেজমেন্টও পড়ানো হয়, এবং এই দুই ডিগ্রি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর নানা ফিল্ডে চাকরি করা যায়। মার্কেটিং, পাবলিসিটি, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং, ম্যানুফ্যাকচারিং বা বায়ার হিসেবে চাকরির সুযোগ রয়েছে। স্টোর বা মলে রিটেল ম্যানেজার হিসেবে চাকরি করা যায়, ইভেন্ট প্ল্যানার, সেল্‌স এজেন্ট বা প্রোডাক্ট ডেভেলপারের চাকরিও হয়।

ফ্যাশন মার্কেটিং আর ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটা ছাত্রছাত্রীদের রিটেল (খুচরো) আর হোলসেল (পাইকারি) ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির জন্য

সারণি

কলেজ	স্থান	কোর্স
১. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি	দিল্লি, কলকাতা, আমেদাবাদ, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ	● **২ বছরের** স্নাতকোত্তর—ডিজাইনিং, ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট ও ফ্যাশন টেকনোলজি।
		● **৩ বছরের** স্নাতক—অ্যাকসেসরি ডিজাইনিং, ফ্যাশন কমিউনিকেশন, নিটওয়্যার ডিজাইনিং, লেদার ডিজাইনিং।
		● **৪ বছরের** ব্যাচেলর ইন ডিজাইনিং, টেক্সটাইল ডিজাইনিং, অ্যাপারেল প্রোডাকশন।
২. ভোগ ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি	বেঙ্গালুরু	● **এমবিএ**—ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং ও রিটেল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইন ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট।
		● **বিএসসি**—ফ্যাশন অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইনিং, লাইফস্টাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল ডিজাইনিং, টেক্সটাইল ডিজাইনিং, গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি। গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা—ফ্যাশন ডিজাইনিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, রিটেল ম্যানেজমেন্ট।
৩. ভবানীপুর ডিজাইন অ্যাকাডেমি	কলকাতা	ফ্যাশন ডিজাইন— (i) ১ বছরের রেগুলার কোর্স (ii) ২ বছরের অ্যাডভান্স কোর্স
৪. পার্ল অ্যাকাডেমি অব ফ্যাশন (নটিংহ্যাম ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত)	দিল্লি	● **৩ বছরের** স্নাতক কোর্স—ফ্যাশন ডিজাইনিং, ফ্যাশন মিডিয়া কমিউনিকেশন, ফ্যাশন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন মার্কেটিং অ্যান্ড প্রোমোশনাল ফ্যাশন স্টাইল অ্যান্ড ইমেজ ডিজাইনিং, টেক্সটাইল ডিজাইন।
		● **২ বছরের** স্নাতকোত্তর কোর্স—ফ্যাশন মার্কেটিং, ফ্যাশন অ্যান্ড টেক্সটাইল ডিজাইন, ফ্যাশন ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন রিটেল ম্যানেজমেন্ট।
		● **১ বছরের** ডিপ্লোমা কোর্স—ফ্যাশন মিডিয়া মেকআপ, ফ্যাশন প্রোমোশন অ্যান্ড ইভেন্ট।
৫. সিমবায়োসিস ইনস্টিটিউট অব ডিজাইনিং	পুণে	● **৪ বছরের** ব্যাচেলর ইন ফ্যাশন ডিজাইনিং, ৩ বছরের ফ্যাশন কমিউনিকেশন।
৬. ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন	আমেদাবাদ	● ডিজাইনে ৪ বছরের ডিপ্লোমা, ২.৫ বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা।
৭. ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন ডিজাইন	চণ্ডীগড়	● **৩ বছরের** বিএসসি—ফ্যাশন ও টেক্সটাইল ডিজাইনিং, টেক্সটাইল ও ফ্যাশন ডিজাইনে ১ বছরের ডিপ্লোমা ও অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা।
৮. এপিজে ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন	দিল্লি	● **ডিপ্লোমা কোর্স**—ফ্যাশন ডিজাইন, টেক্সটাইল ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন।
৯. নর্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজি	মোহালি	● **৩ বছরের** স্নাতক কোর্স—ফ্যাশন ডিজাইনিং ও টেক্সটাইল ডিজাইনিং।
		● **২ বছরের** স্নাতকোত্তর কোর্স—ফ্যাশন মার্কেটিং, গারমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি।

তৈরি করে দেয়। আপাতভাবে যে বিষয়গুলো ইন্ডাস্ট্রির বাইরের লোকজন তেমনভাবে বুঝতে পারে না, সেই প্রোডাকশন, মার্কেটিং, অ্যাডভার্টাইজিং (বিজ্ঞাপন) আর বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতো বিষয়গুলো পড়ার সুযোগ থাকে। এমবিএ করা ছাত্রছাত্রীরা নিঃসন্দেহে বাড়তি গুরুত্ব পাবে, কিন্তু এই ফিল্ড সম্পর্কে যাদের আইডিয়া রয়েছে, তারা নিঃসন্দেহে আরও ভালো কাজ করবে।

নামী ব্র্যান্ডে চাকরির সুযোগ পেলে শুরুতেই মোটা টাকা মাইনে আর পার্কস বা অন্যান্য বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। এরপর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আয়ের অঙ্কও বাড়তে থাকে। শুধু বিদেশি নয়, নানারকম দেশি ব্র্যান্ডেও এখন প্রচুর কাজের সুযোগ।

প্রার্থীর যোগ্যতা

যারা এই ফিল্ডে কাজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ডিগ্রির পাশাপাশি ফ্যাশনে আগ্রহ থাকাটা তো বাধ্যতামূলক। সেই সঙ্গে গতিময় জীবন আর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো মনের জোর থাকাটাও খুব দরকার। আগে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে এই ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধে পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে সাবলীল হতে হবে, যেখানে সুযোগ বেশি, সেখানে গিয়ে ডেরা বাঁধতে হবে প্রয়োজনে।

কোথায় কী পড়ানো হয়

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি (নিফ্‌ট)-তে চার বছরের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ফোটোগ্রাফি, গ্রাফিক ডিজাইন, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং, ফ্যাশন জার্নালিজম, অ্যাডভার্টাইজিং, রিটেল ম্যানেজমেন্ট আর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি পাওয়া যায়। নিফ্‌টেই ফ্যাশন ম্যানেজমেন্টে দু' বছরের পুরো সময়ের মাস্টার্স প্রোগ্রাম রয়েছে। সেখানে মার্কেটিং, এক্সপোর্ট, রিটেল সেক্টর ইত্যাদি নিয়ে বিশদে জানার সুযোগ রয়েছে। ভারতের যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত তিন বছরের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি বা তার সমতুল্য যোগ্যতা থাকলে তবেই এই বিষয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। ডিজাইনিং পড়তে গেলে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট কোর্সও করতে পারেন। ফ্যাশন টেকনোলজি পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্য দ্বাদশ স্তরে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা বাধ্যতামূলক। তারপর প্রবেশিকা পরীক্ষা থাকে। এই সমস্ত প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন ও মান নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানেই। এর পর ইন্টারভিউ (সাক্ষাৎকার) নেওয়া হয়। এই দুই বাছাই পর্বের শেষেই পড়ুয়া ভর্তি নেওয়া হয়। তবে ডিজাইনিং বা অন্যান্য কোর্সগুলির ক্ষেত্রে বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানই সরাসরি ভর্তির ব্যবস্থা আছে।

পড়ার খরচ

পড়ার খরচ অন্যান্য প্রফেশনাল কোর্সের মতোই। কোর্সের ভেতরেই ফ্যাশন-শো, ডিজাইনার কালেকশন তৈরি করা এই সব ব্যয়বহুল কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে খরচ একটু বেশি মনে হতে পারে। ম্যানেজমেন্ট পড়ার ক্ষেত্রে মোটামুটি দু' বছরের পড়ার খরচ এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা, অর্থাৎ ছ' মাসের প্রতি সেমেস্টার বাবদ খরচ পড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা।❑

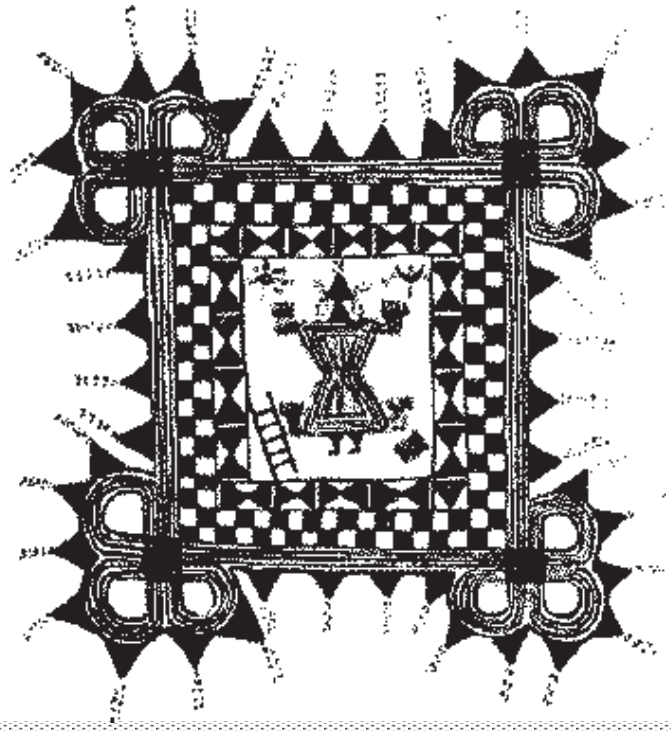

যোজনা ? কুইজ

১. রাষ্ট্রসংঘ পরিচালিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষ বৈঠক, ২০১৪ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

২. ভারত ও নেপালের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ সামরিক মহড়াটির নাম কী?

৩. বিলিয়ার্ডসের টাইম ফর্ম্যাটে কোন ভারতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন?

৪. মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চুয়াল্লিশ বছর বয়সে শপথ নিলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। এই রাজ্যের কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

৫. 'গোল্ডেন গার্ল' কার আত্মজীবনীর নাম?

৬. ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সাহিত্য সম্মান ম্যান বুকার, ২০১৪ কে পেয়েছেন?

৭. জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস কোন দিনটিতে পালন করা হয়?

৮. 'পানাভিয়া টর্নেডো' যুদ্ধ বিমানগুলি কোন দেশের উদ্যোগে নির্মিত?

৯. 'ব্যাটল অব গঙ্গা অ্যান্ড যমুনা : মহাভারত টুয়েলভ' নামক বিখ্যাত চিত্রটি কার সৃষ্টি?

১০. 'দ্য কম্পিউটার হিস্টরি মিউজিয়াম' (কম্পিউটারের ইতিহাস-সংক্রান্ত জাদুঘর) কোথায় অবস্থিত?

১১. নিউজিল্যান্ডের জাতীয় খেলার নাম কী?

১২. বিশ্বে প্রথম ডাকটিকিট কোন দেশে চালু হয়?

১৩. এ.পি. (অ্যাসোশিয়েটেড প্রেস) সংবাদ সংস্থাটি কোন দেশের?

১৪. আমাদের শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ কোনটি?

১৫. 'মিত্র মেলা' নামক যুব সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর :

১. রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতর নিউইয়র্কে। ২. সূর্য কিরণ-সপ্তম। উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়ে ১৪ দিনের যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হয়। ৩. পঙ্কজ আদবানি। তিনি ব্রিটেনের রবার্ট হলকে ১৯২৮-৮৯৩ ফলাফলে হারিয়ে দেন। ৪. শরদ পাওয়ার। ৩৮ বছর বয়সে। ৫. পি.টি. উষা। ৬. অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যিক রিচার্ড ফ্ল্যানাগান। তিনি তাঁর ষষ্ঠ উপন্যাস 'দ্য ন্যারো রোড টু দ্য ডিপ নর্থ' উপন্যাসের জন্য এই সম্মান পেলেন। ৭. ২ ডিসেম্বর। ৮. ব্রিটেন (ব্রিটিশ এরোস্পেস), জার্মানি (এম.বি.বি.) ও ইতালি (এরিটালিয়া)। 'পানাভিয়া টর্নেডো' পরমাণু অস্ত্র ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র বহন করতে সক্ষম। ৯. মকবুল ফিদা হুসেন। ১০. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউ শহরে। ১১. রাগবী। ১২. ইংল্যান্ডে। ১৮৪০ সালের মে মাসে। ডাকটিকিটটির নামছিল 'পেনি ব্ল্যাক'। ১৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪৬ সালে। ১৪. দাঁতের এনামেল। ১৫. মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

ভারতীয় সংস্থাগুলি বিদেশে পাড়ি দেয় কেন?

"দিবে আর নিবে।" নিছক কথার কথা নয়। লগ্নি প্রসঙ্গে ভারতকে নিয়ে হলফ করে একথা বলার দিন এসেছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানার পাশাপাশি ইদানীং বিদেশে লগ্নিতেও ভারতের ভূমিকা হেলাফেলার নয়। কী করে সম্ভব হল এ উলটপুরাণ। কারা এর হোতা। তার হদিশ মিলবে **ভি. এন. বালাসুব্রমনিয়াম** *ও* **নিকোলাস ফরসাঁস***-এর এই লেখায়।*

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ

নীতি পরিবর্তন এবং রাজ্যভিত্তিক বৈচিত্র

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে ভারতীয় নীতির পর্যালোচনা ও ক্রম পরিবর্তন এই নিবন্ধে তুলে ধরেছেন লেখক **সজিন শিন**। *বর্তমানে এ বিষয়ে কেন্দ্রের অনুকূল মনোভাব সত্ত্বেও রাজ্যভেদে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণগত ফারাক এতটা বেশি কেন, উদাহরণ সহযোগে রয়েছে তারও মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ রয়েছে এই নিবন্ধে।*

ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের আঞ্চলিক বৈষম্য

একটি সমীক্ষা

*কোনও দেশের আর্থিক বিকাশ ত্বরান্বিত করতে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি ঋণ বহির্ভূত আর্থিক মূলধন হওয়ায় অন্যান্য মূলধনি পুঁজির মধ্যে একেই সবসময় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাই এই বিনিয়োগ টানতে বিভিন্ন দেশ, বা একই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে প্রতিনিয়ত। কখনও ভরতুকি হারে জমি, জলের ব্যবস্থা করে, কখনও বা আন্তঃশুল্কে ছাড় দিয়ে আবার কখনও বা সম্পত্তি কর আদায় মুলতুবি রেখে বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব দেশে বা একটি দেশের সব অঞ্চলে সমানভাবে এই বিনিয়োগ আসে না। কিন্তু কেন? কেনই বা ভারতে আসা মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৭০ শতাংশ মাত্র ছয়টি রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে? কোন কোন বিষয় এই বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার করে? তারই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***ড. এস আর কেশব।**

সেকেলে আইনের উভয় সংকটে অনাবাসী ভারতীয় সমাজ

প্রবাদ বলে পরিবর্তনই এই দুনিয়ায় একমাত্র চিরস্থায়ী। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পালটে নিতে হয় পুরোনো ধ্যানধারণা। কোনও একটি বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যে আইন প্রণীত হয় পরিবর্তিত সময়ে দাবি মেনে তাকে যুগোপযোগী করে নিতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও সেই পুরোনো, ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইনগুলি রয়ে গেছে। এই আইনগুলি প্রতিনিয়ত সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করছে। নাগরিকত্ব বা বিদেশি নাগরিক সংক্রান্ত আইনগুলির ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য। একদিকে যখন দেশে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের আয়োজন করে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য এদেশের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে কিছু সেকেলে ঔপনিবেশিক আইন এখনও বজায় রেখে যে কোনও সময় কোনও 'বিদেশি'-কে বহিষ্কারের জন্য রাষ্ট্রকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কেন এই অসংগতি? দেশের নাগরিকত্ব বা বিদেশি নাগরিকদের বিষয়ে পুরোনো আইনগুলিতেই কী বলা হয়েছে আর কী করলে সমাধানের পথ পাওয়া যাবে—আলোচনা করেছেন **অনিল মালহোত্রা।**

আগামী ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মা গান্ধীর দেশে ফেরার ১০০ বছর পূর্ণ হবে। এই ঘটনাকেই স্মরণীয় করে রাখতে ওই বছরের ৯ জানুয়ারি আহমেদাবাদে উদ্‌যাপিত হবে 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস'। ওই দিন বিশ্বের সমস্ত অনাবাসী ভারতীয়কে তাঁদের মাতৃভূমিতে স্বাগত জানানো হবে। কিছু দিন আগেই নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্টেডিয়ামে বিপুল জনতার সামনে তাঁর ভাষণে আবেগদৃপ্ত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনসমাজের জন্য ভারতের দরজা খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি বা পিআইও কার্ডধারীরা যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সারা জীবনের জন্য এদেশের ভিসা পেতে পারেন সেজন্য পিআইও এবং অনাবাসী ভারতীয় নাগরিক (ওসিআই) প্রকল্প দুটিকে মিশিয়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি। এরপরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যে পিআইও কার্ড সারা জীবনের জন্য বৈধ থাকবে এবং এই কার্ডধারীদের পুলিশের কাছে রিপোর্টিং এবং বিদেশিদের আঞ্চলিক নিবন্ধীকরণ কার্যালয়ে নিবন্ধীকরণের নিয়ম থেকে ছাড় দেওয়া হবে। খুবই ভালো উদ্যোগ সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন এই আহ্বান শুনে জনসমাগম হবে তখন কী হবে? আমরা এই আহ্বানকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু একবারও কি তলিয়ে দেখেছি অনাবাসী ভাইবোনেরা যখন দেশে ফিরবেন তখন আমরা তাদের কী দিতে পারব? বিশেষ করে যে ভারতীয় আইনের দ্বারা তাদের দেশের বাড়ির পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে তারা কতটুকু সুবিধা পাবেন? আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের ফলে দ্রুত বদলে যাওয়া এই প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে যে এই দেশীয় আইনগুলি সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণ করতে পারবে কি না। কারণ অনাবাসী ভারতীয়রা যদি আবার তাঁদের শিকড়ে ফিরে বসবাস করতে চান তাহলে প্রথমেই তাঁরা আইন সংক্রান্ত বিষয়ে এই প্রত্যাশা নিয়েই আসবেন। তাই প্রথমেই আমাদের দেশের আইনগুলি কতটা সময়োপযোগী তার একটা মূল্যায়ন করতে হবে।

অনাবাসী ভারতীয় বিষয়ক মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশে ২,১৯,০৯,৮৭৫ অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) বসতি গড়ে তুলেছে, ক্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের প্রকৃত সংখ্যাটা ৩ কোটির কাছাকাছি। আন্তর্জাতিক ভারতীয়রা নিজেরাই একটি জাতি। তাই বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা ভারতীয়দের নানান দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনের ভীষণভাবে প্রয়োজন। ভারতে এবং বিদেশে বৃহত্তর পরিবারের সঙ্গে তাদের সংযোগ বা যোগাযোগ বজায় রাখার সঙ্গে যে অবশ্যম্ভাবীভাবে অভিবাসন, জাতীয়তা, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, বাবা বা মা যে কোনও একজনের হেফাজতে শিশুকে হস্তান্তর, স্বামী/স্ত্রীর ভরণপোষণ, বৈবাহিক সম্পত্তির ভাগাভাগি, অন্য কোনও দেশের শিশুকে দত্তক গ্রহণ, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি লাভ, ভারতীয় সম্পত্তির স্বত্ব এবং অবশ্যই গর্ভ ভাড়া দেওয়া-নেওয়া বা সারোগেসি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি এসে পড়ে। সময়োপযোগী এবং সংশোধিত ভারতীয় আইনের অভাবে এই সমস্ত ব্যাপারে নানান সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিদেশি আদালত ও বিদেশের আইনজীবীরাও আতান্তরে পড়েন এবং সেজন্য তাঁরা এই নতুন যুগের নতুন সমস্যাগুলির ক্ষেত্রে আইনের নতুন করে ব্যাখ্যা দাবি করেন। এদেশে বিদেশি আইন